ভুট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ

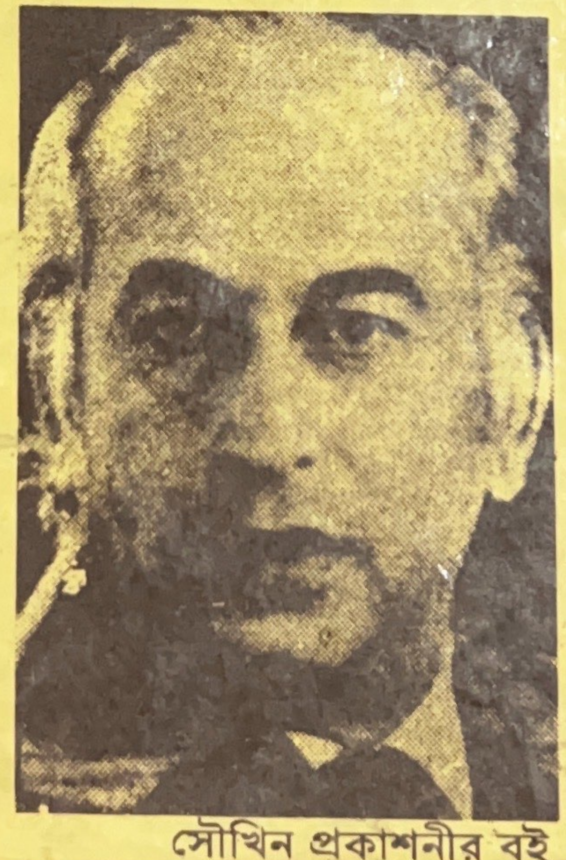

সৌখিন প্রকাশনীর বই

ভুট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ

[জিয়া অধ্যায় ও ৬৫টি রাজনৈতিক ছবি সহ]

রাও ফরমান আলীর
ডাইরী অবলম্বনে

অনুবাদ
মোস্তফা হারুন

187, North Shahjahanpur
(Khilgaon Railgate)
Dhaka-1217, Bangladesh
Tel : 838947 Fax : 836635

সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা

ফোন: ৪১৫২৪৫

সৌখিন গ্রন্থমালা – ১১

সৌখিন প্রকাশনীর পক্ষে মুরাদ পাশা (স্বপন)

কর্তৃক ৩৫/২, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর ১৯৭৮ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	ডিসেম্বর ১৯৭৮ ইং
পূনর্মুদ্রণ	:	জানুয়ারী ১৯৭৯ ইং
তৃতীয় সংস্করণ	:	এপ্রিল ১৯৮৯ ইং
চতুর্থ সংস্করণ	:	আগষ্ট ১৯৮৯ ইং
পঞ্চম সংস্করণ	:	১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং
গ্রন্থসত্ব	:	জাহানারা হারুণ

সূত্র : উর্দু ডাইজেষ্ট (মার্চ, এপ্রিল ও মেত্ত্ব ৭৮ সংখ্যা), প্রথমে রাও ফরমান আলীর ডাইরী নির্ভর সমুদয় বক্তব্য টেপে বাণীবদ্ধ করে সম্পাদক আলতাফ হোসেন কোরেশী কর্তৃক লিপিবদ্ধ করে উর্দু ডাইজেষ্টে প্রকাশ করেন। অনুবাদের অনুমতি সহ অতঃপর সৌখিন প্রকাশনী কর্তৃক ঢাকাতে বাংলাতে প্রকাশিত।

আলোক চিত্র সংগ্রহ : মুরাদ পাশা (স্বপন) ও শহীদুল হক (স্বপন)

প্রকাশনা সহকারী : মুরাদ পাশা (স্বপন)
শাহ গোলাম মুহম্মদ (জামাল)
মোঃ ইদ্রিস আলী বিশ্বাস
শফিকুল ইসলাম (হিটলার)

প্রচ্ছদ : সৈয়দ লুৎফুল হক

মুল্য : ~~৪০ টাকা~~
৫০ টাকা (বাঁধাই)

Bhutto Shaikh Mujib Bangladesh Translated into Bengali by Mustafa Haroon from a Biography of General Rao Forman Ali.
Published by
Murad Pasha (Swapan) on behalf of the
Soukhin Prokasony,
35/2, Kakrail, Dhaka-1000,
Bangladesh.
Price: Tk-~~40.00~~
Tk-50.00 (Board)

প্রাপ্তিস্থান :
ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, বিজয়নগর, ঢাকা
কারেন্ট বুক সেন্টার, চট্টগ্রাম
মনিবাটিক, হোটেল আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
নওরোজ কিতাবিস্তান, নিউমার্কেট, ঢাকা
মহিউদ্দিন এণ্ড সন্স, নিউমার্কেট, ঢাকা
আলীগড় লাইব্রেরী, নিউমার্কেট, ঢাকা
জোনাকী, হোটেল শেরাটন, ঢাকা
কিয়স্ক, হোটেল সোনারগাঁও, ঢাকা

নিবেদন

ইউরোপ সফর শেষে দেশে ফেরার পথে করাচী এয়ারপোর্টে স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় ভোলার প্রাক্তন এম, পি, ও বিশিষ্ট জননেতা জনাব মোশাররফ হোসেন তালুকদার রাও ফরমান আলীর এ লেখাটি সম্পর্কে আলোচনা শোনেন এবং দেশে ফিরে আমাকে লেখাটি সংগ্রহ করে পড়তে বলেন। লেখাটি যেহেতু রাও ফরমান আলীর, এজন্য আমি বেশী উৎসাহবোধ করিনি। কারণ, আমাদের কাছে এ লোকটির স্মৃতি বড়ো বেদনাদায়ক। বিগত স্বাধীনতা – যুদ্ধে বিভিন্ন কায়দায় বাঙ্গালী নিধনের কাজে যারা ঠাণ্ডা মাথায় নিয়োজিত ছিলেন, সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন তাদের শীর্ষে।

বিশ্ব ইতিহাসে এমন অনেক দুর্ধর্ষ জেনারেল গত হয়েছেন, যারা শুধু হুকুম তামিল করার জন্যই যুদ্ধ করেছেন; ব্যক্তিগতভাবে এরা ছিলেন যুদ্ধবিরোধী এবং সংবেদনশীল। এসব কথা ধরা পড়েছে পরবর্তীকালে লিখিত তাদের আত্মজীবনী বা ডায়রীতে, যা পড়ে লোকেরা অভিভূত হয়েছে। রাও ফরমান আলীর চিন্তাধারা ও উপস্থাপনাও ঠিক সে পর্যায়ের কি-না, তা অনুধাবন করার জন্য আমি লেখাটি সংগ্রহে সচেষ্ট হই। পড়ে দেখলাম, লেখাটিতে মুক্তমন ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার স্বাক্ষর যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে উপমহাদেশের ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ। মোটামুটিভাবে এ লেখাতে আইউব খান থেকে শুরু করে ২৫ শে মার্চ '৭১-এর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক জান্তার কোন্দল, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অন্তরঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাঞ্জাবীদের নির্যাতন এবং বাঙ্গালীদের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে মূলতঃ কার গোপন হাত সক্রিয় ছিল ? উপমহাদেশে মানবতার এই অবমাননার পেছনে কার নেপথ্য ভূমিকা ছিল ? –তিনি হলেন, ভূট্টো। সকল ঘটনার কলকাঠি ঘুরিয়েছেন ভূট্টো, আইউব –ইয়াহিয়া ছিলেন তার ক্রীড়নক মাত্র। এ অপ্রিয় সত্য কথাটাই নিঃসংকোচে, নির্বিবাদে বলতে পেরেছেন বলেই এ লেখার প্রতি আমি আকৃষ্ট হই এবং এর অনুবাদ পাঠকদের উপহার দিতে সচেষ্ট হই। এ লেখাতে সুক্ষ্মভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন, ভুল তথ্য পরিবেশন ও শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সামান্য কটাক্ষ (যদিও এখানকার লোকেরা এর চাইতে বেশী তার নিন্দা করেছেন) ছাড়া বেশীর ভাগ বক্তব্যই আমাদের জাতীয়তাবাদী দর্শনের অনুকূলে হয়েছে।

লেখাটিতে জুড়ে রয়েছে বিগত দিনের কথা, যার অনেক কিছুই আমাদের জানা, কিছু রয়েছে অজানা। জানা-অজানা সব কথাই মানুষের মনে করতে হয় ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ সচেতনতার প্রয়োজনে। আমাদের অতীত যেহেতু ভুল এবং ত্রুটির উর্ধে নয়, এজন্য অনাগত দিনগুলোতে ভুলকে এড়িয়ে চলার জন্য মাঝে মধ্যে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়।

এ লেখাটি সম্পর্কে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ যদি তাদের মনের প্রতিক্রিয়া আমাদের লিখে জানান, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে নামধাম সহ তা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হবে।

– মোস্তফা হারুন

ফোনঃ ৪১৫২৪০

সৌখিন প্রকাশনীর বই

* আমার মতোগান – জেব–উন–নেসা জামাল
* পাতালে শর্বরী – ডঃ মিজানুর রহমান শেলী
* নিষিদ্ধ সুখের যন্ত্রনা – সাদেকা শফিউল্লাহ
* ঝরা পালকের গান – তালুকদার শাজাহান
* দেশ–বিদেশের মেয়েরা – মোস্তফা হারুণ
* হজরতের পত্রাবলী – মোস্তফা হারুণ
* মান্টো এবং কালো শেলোয়ার – মোস্তফা হারুণ অনুদিত
* ব্রেইন ফেন্টাসী – মোস্তফা হারুণ
* ভূট্টো শেখমুজিব বাংলাদেশ – মোস্তফা হারুণ
* কবি মোজাম্মেলহক – মোস্তফা হারুণ সম্পাদিত
* ইসমাইল হোসেন সিরাজী – মোস্তফা হারুণ সম্পাদিত

আমাদের পরবর্তী সংস্করনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আরো দুর্লভ ছবি পত্রস্থ করা হবে। বর্তমানে ছবি সংগ্রহের কাজ চলছে, এব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কাম্য।

সৌখিন প্রকাশনী

৩৫/২, কাকরাইল,

ঢাকা–১০০০

ফোন: ৪১৫২৪০

এক নজরে

- দীর্ঘদিনের বঞ্চনা বাঙ্গালীদের মন-মানসিকতাই গড়ে তুলে ছিল অন্য ধাঁচে।
- মোনেম খানের মধ্যে কোন সুদৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ছিল না, তিনি গায়ের জোরে শান্তি রচনার প্রয়াসী ছিলেন।
- এখানকার লোকেরা রাজনীতি ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে বেশীরকম 'সেক্যুলার' ছিল।
- লোকেরা মনে করতো, আইউব খান নামক আমাদের একজন বাদশা আছেন; মোনেম খান হচ্ছেন, তার অনুগত সুবেদার।
- পশ্চিম পাকিস্তানীদের 'বুরুক্রেসী' প্রেম-ভালবাসার সকল নিগড় সমূলে বিনষ্ট করে দিয়েছিল।
- পাকিস্তানের ৪ ডিভিশন সৈন্যের বেতন আইসেন হাওয়ার বহন করতেন।
- পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বলে বসলেন, শেখ মুজিব ছাড়া আমরা বৈঠকে বসব না।
- আমি প্রতিবাদ করে বললাম, মার্শাল ল' শুধু পূর্ব পাকিস্তানে জারি করা চলবে না।
- সামরিক বাহিনীর লোকেরা সরল অন্তঃকরণের হয়ে থাকে, রাজনৈতিক নেতাদের চালের মারপ্যাচ বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। এসব করে তারা চিরকাল সেনাবাহিনীর লোকদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসেন, যেখান থেকে তাদের আর ফিরে আসা সম্ভব হয় না।
- ২৪ শে মার্চ ভুট্টো এক গোপন 'মিশনে' লারকানার নামে রাওয়ালপিণ্ডি রওয়ানা হয়ে যান।
- মুজিব বজ্রকন্ঠে বললেন, আমি এল, এফ, ও, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব।
- নির্বাচনের সময় শিল্পপতিদের উপর চাপ দিয়ে আওয়ামী লীগের বিরোধী দলগুলোকে ২০/২২ লাখ টাকা যোগাড় করে দেয়া হয়েছিল।

- ভুট্টো ছ'দফার আলোচনা রেখে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী পরিষদ গঠনের কথা তোলেন।
- শেখ মুজিব আমাকে টেলিফোন করে চরম অস্থিরতা প্রকাশ করে বললেন, ঢাকা তাদের জন্য বধ্যভূমি হলে পশ্চিম পাকিস্তান আমার জন্য হবে জবাইখানা।
- আমাকে দেখেই ইয়াহিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বললেন, বদমাশটাকে শিক্ষা দিতে হবে, এখানে না এসে সে আমাকে দারুণ অপমান করেছে।
- ভুট্টো বললেন, আওয়ামী লীগ এক বুর্জোয়া পার্টি, সেনাবাহিনী মোকাবিলার ক্ষমতা তাদের নেই।
- মুজিব হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন না। সংযতভাবেই বললেন, এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক, আমাদের সাথে প্রতারণা করা হলো।
- সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং জেনারেল খাদেম রাজাও পদত্যাগের কথা বললাম। কিন্তু–
- আমি বললাম, শেখ সাহেব। পাকিস্তান এখনও বাঁচানো যায় কি? বললেন, বাঁচতে পারে, তবে এসব চিন্তা করার মতো মানসিক অবস্থা থাকতে হবে তো আমার। আমার লোকেরা পথে–ঘাটে বেঘোরে মারা যাচ্ছে, আমি দু'দিন থেকে বিছানায় পিঠ দিতে পারিনি।
- 'লাউঞ্জে' বসে টেবিলে পা তুলে ইয়াহিয়া, হামিদ, ভুট্টো মদ্যপান করছিলেন। সহসা আমার মনে হলো, রোম জ্বলছে আর সম্রাট নীরো বাঁশী বাজাচ্ছেন।
- আজ পূর্ব পাকিস্তান এক বিপজ্জনক বাঁকে এসে উপনীত। এক আমল, এক নেতৃত্বের যবনিকাপাত হয়ে শতাব্দীর কান্না বিজড়িত একটি মুহূর্তে জেগে উঠল একটি দেশ, একটি জাতি।

পত্র প্রাপ্তি

সহৃদয় পাঠকদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য চিঠির মধ্য থেকে কেবল সাধারণ ক'টি লেখার নির্য্যাস ছাপা হলো। বিতর্ক এড়ানোর জন্য অনেক রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের চিঠি পত্রস্থ করা গেলো না।

মুসলমানদের কোরান প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন ভিন্ন ধর্মের লোক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, তেমনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নিরপেক্ষ পটভূমিকা তুলে ধরলেন একজন অবাঙ্গালী। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের যে সংকট চলছে, তা নিরসনের প্রথম উপস্থাপনা হচ্ছে এ বইটি, আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

— পূর্ণিমা দাশ, বগুড়া রোড, বরিশাল

প্রখ্যাত অনুবাদক ও সাহিত্য-শিল্পী জনাব মোস্তফা হারুণের এই বইটি তার সকল অনুবাদ কর্মকে পেছনে ফেলে অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে গেছে। জাতীয় সংগ্রামের বিষয় নিয়ে রচিত এ ধরনের একটি বই আমাদের ইতিহাসের যাত্রাপথে একটি মাইলস্টোন বিশেষ। এমন ফ্লেভারসমৃদ্ধ অনুবাদ খুব কমই পড়েছি।

— সৈয়দ আলী নকী, দৌলতপুর, খুলনা।

আমাদের স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে হবে। এ দেশ আমাদের। এর যা কিছু লজ্জা আমাদের। এর দৈন্য আমাদের। এর অভাব আমাদের। আজকে আমাদের ঘাত-প্রতিঘাতের পেছনে থাকা চাই একটা দরদ, একটা ভালবাসা। আপনার লোককেও দরকার হলে আঘাত করতে হয়। কিন্তু তখনই সেই আঘাত সার্থক হয়, যখন তাকে আঘাত করতে গিয়ে নিজেদের মনেও সমান বেদনা জাগে। এইরূপ বেদনা কি জেগেছিল রাও ফরমান আলীর হৃদয়ে? আমরা জাতির ভাল-মন্দের একমাত্র বিচারক নই। জাতির যারা প্রকৃত কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা রাজনৈতিক চিন্তাধারার অধিকারী, তারাই জাতির ভাল-মন্দের বিচার করতে পারেন।

পাঞ্জাবী শাসনকে আমরা ঘৃণা করতে পারি, কিন্তু পাঞ্জাবের মানুষকে যেন ঘৃণা না করি। এটাই আমার উপলব্ধি। ভেতরে যে সিংহ ঘুমিয়ে থাকে, সুখের সুড়সুড়িতে সে জাগে না; তাকে জাগাতে হয় বেদনার তীব্র কশাঘাতে। এই বেদনাই শেখ মুজিবকে একদিন করেছিল মহান নেতা।

— হাবিব উল্লা খাঁন

খামার পাড়া, ঝিকরগাছা, যশোহর

রাও ফরমানের বক্তব্যে বাংলার অর্ধ দশক কালের অবক্ষয়ের উত্তরে শেখ মুজিবকে যেমন নতুন করে খুঁজে পাওয়া যায় আপন মহিমায়, তেমনি ক্ষমাহীন ঘৃণা জর্জরিত করে তাদের, যারা মুজিবের কর্ম উত্তরণকে ব্যর্থতায় করেছে কলুষিত।

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যে ভুল ব্যাখ্যা আছে, যা শুধুমাত্র তাঁর অনবধানতার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। হারুণ ভাইয়ের প্রচেষ্টা শাখায়-পল্লবে ছড়িয়ে পড়ুক দেশ থেকে দেশান্তরে-মনেপ্রানে এই প্রার্থনা করি।

— মোঃ ইকবাল হোসেন, ৩, আর কে মিশন রোড, ঢাকা

লেখক রাও ফরমান আলী এদেশে নির্মম অত্যাচার কাহিনীর একজন নায়ক। তার বাঙ্গালী-বিদ্বেষ লেখার মধ্যেই প্রস্ফুটিত যেমন আল্লাহর ইংরাজী অনুবাদে 'লর্ড' ও মাস্টার' বলা শুদ্ধ, কিন্তু বাংলায় 'প্রভু' বলা অধর্ম, হিন্দুয়ানীর পরিচয়। এ সত্ত্বেও লেখক একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও কর্মকর্তা হিসেবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, দীর্ঘকাল পাকিস্তানী তাচ্ছিল্য ও অনাচার ও অবশেষে ভূট্টোর দুরাকাঙ্খার ষড়যন্ত্রজাত হত্যাকান্ডের ফলেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতে বাধ্য হয়েছে তাই আমাদের সংগ্রাম সাহিত্যে এ বইটি একটি মূল্যবান দলিল। বইটির ভাষা, ছাপা ও 'গেট-আপ' সুন্দর হয়েছে।

– মাহমুদ হায়দার

রিটায়ার্ড আই, জি, পি, লালমাটিয়া, ঢাকা

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তাঁর নায়ক শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে যে মুহূর্তে বিতর্কিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে এ ধরনের বই-এর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য্য।

নরমেধযজ্ঞের অন্যতম হোতা রাও ফরমান আলী স্বয়ং স্বীকার করেছেন, পাকিস্তানী শোষক শ্রেণী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্যে এ দেশে এক শ্রেণীর ভাড়াটে রাজনীতিবিদ ও ছাত্রদল পোষণ করেছে।

রাও ফরমান আলীর লেখা ক্রটিমুক্ত না হলেও এ বই পাঠে অনেকেই মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন। এটাই আপনার শ্রমের সার্থক অবদান।

— ইবনে আমজাদ, ৪৪, কাঠাল বাগান, ঢাকা

'ভূট্টো-শেখ মুজিব-বাংলাদেশ' পড়ে '৭১ সালের তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকমণ্ডলী ও রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা-অজানা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। সবচাইতে এটাই আমার কাছে বেশী রেখাপাত করেছে, সে দিনের একজন দুর্ধর্ষ সমর-নায়ক হিসেবে যার পরিচিতি, তার লেখাতেই এক বিরাট সত্য উদঘাটিত হলো। লেখাটিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, মুক্তমন ও সত্যকে সত্য বলে বিচার করতে কুন্ঠাবোধ করেননি।

— দেওয়ান মোঃ ইকবাল চৌধুরী, হবিগঞ্জ, সিলেট

"বইখানা পড়ে যথার্থই মনে করলাম, আমার বইখানা ক্রয় বাবদ দেয় টাকা সার্থক হয়েছে, একটানা আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে কখন যে বইখানা শেষ করেছি, তা মোটেও টের পাইনি।

নিরপেক্ষ লেখক ও সার্থক অনুবাদকের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম রইল।

— মোসলেহউদ্দীন সরোয়ার, বি, এ,

জেমস্ ফিন্‌লে এন্ড কোঃ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

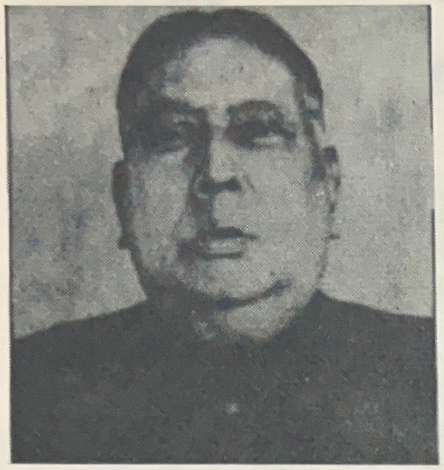

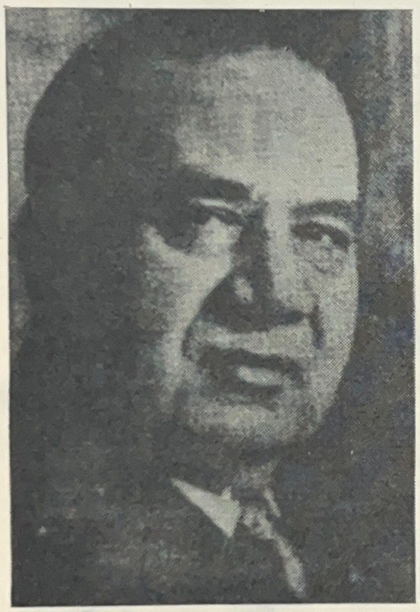
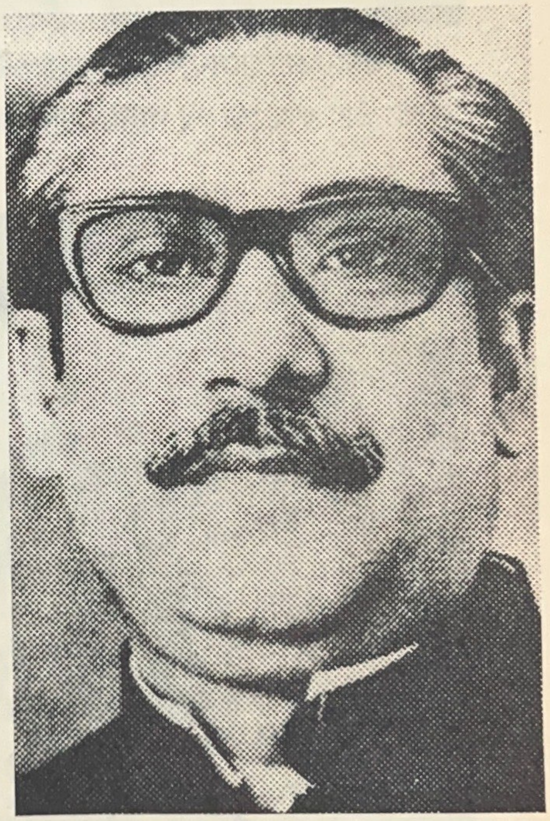

ইতিহাসের স্থপতি, তিন মহান জননেতা শেরেবাংলা, মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এদেরই অন্যতম যোগ্য উত্তরসুরী ছিলেন শেখ মুজিব। ইতিহাসের এই তিন ব্যক্তিত্ব আজ আর আমাদের মাঝে নেই, রয়ে গেছে তাদের আদর্শ, ত্যাগ ও মহিমা

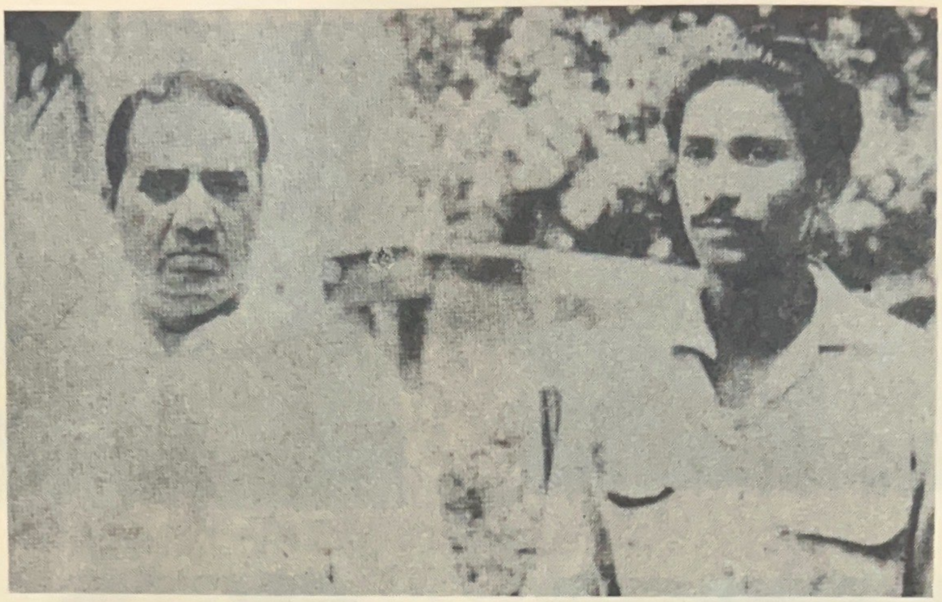

মহান জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওর্দীর পাশে শেখ মুজিব। শেখ মুজিব মুলত: তাঁর কাছ থেকেই পার্লামেন্টারী রাজনীতির দীক্ষা গ্রহন করেন

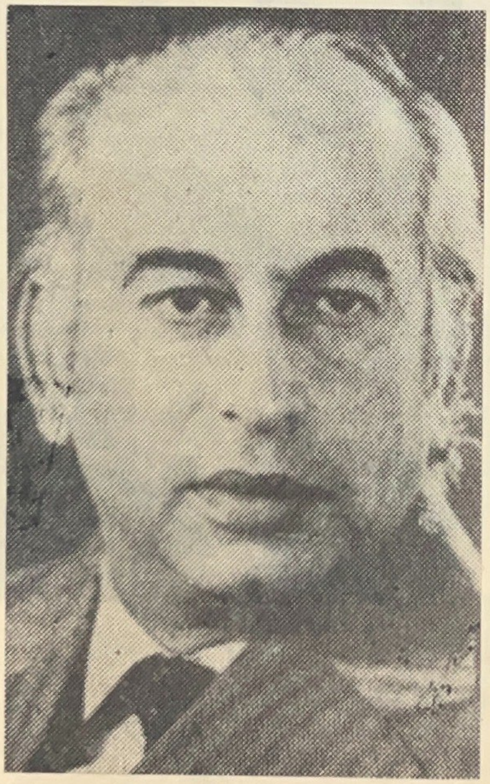

লারকানার নওয়াব শাহনওয়াজ
ভূট্টোর সুদর্শন সন্তান
জুলফিকার আলী ভূট্টো

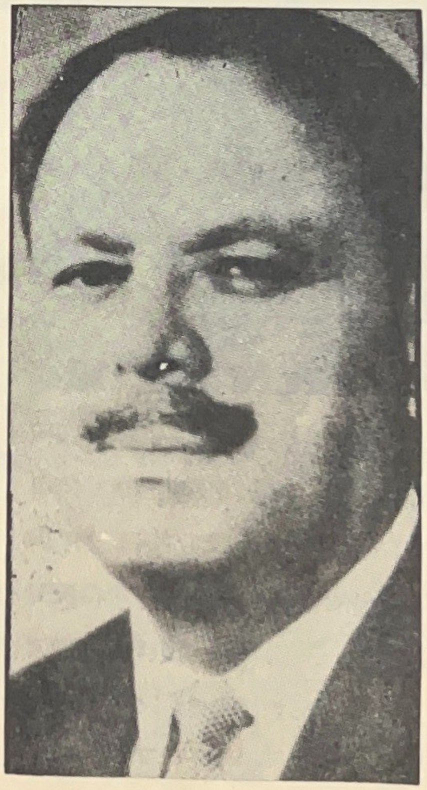

ডিকেডের নায়ক
ফিল্ডমার্শাল আইউব খান

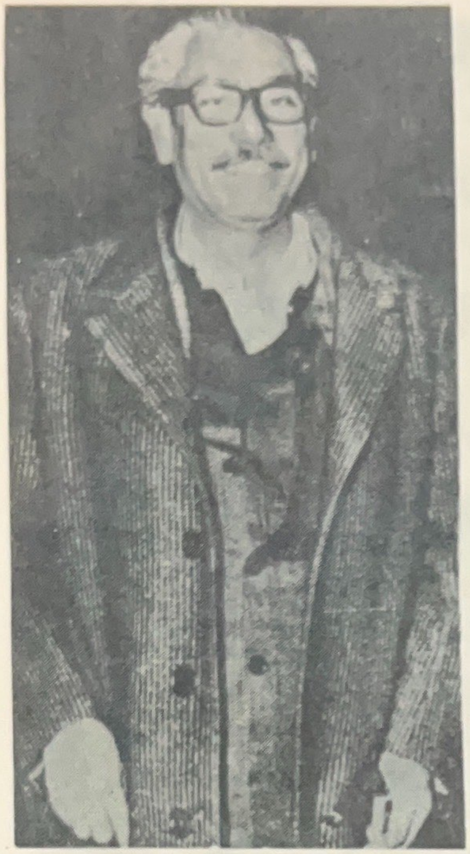

হিথ্রো বিমান বন্দরে শেখ মুজিব। পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর লন্ডন হয়ে ঢাকা আসার পথে

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দের মুনাজাতের দৃশ্য

১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে প্রভাত ফেরী করছেন ছাত্র নেতা শেখ মুজিব। প্রায় ৩৬ বছর আগের তোলা একটি দূর্লভ চিত্র

বাঙ্গালীদের ওপর আরেক দূর্যোগ এসেছিল সত্তর সালের ১২ই নভেম্বরের জলোচ্ছাসের কালোরাতে। দেশের দক্ষিনাঞ্চল ভোলা, হাতিয়া, সন্দীপ অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলের লক্ষলক্ষ লোক এই জলোচ্ছাসের পানিতে ভেসে গিয়েছিল।বিশ্ব বিবেক কেঁপে উঠেছিল এই ঘটনায়। মওলানা ভাসানী ২৩শে নভেম্বর'৭০ তারিখে আক্ষেপ করে বলেছিলেন "ওরা (পাকিস্তানী কর্তাব্যক্তিরা) এই দুর্যোগের সময় কেউ আসেনি"

পাকিস্তানের স্থপতি কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিনাহ্ একজন সৈনিককে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন, পাশে তদানীন্তন সেনাপতি জেনারেল আইউব খান। পরে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নাটকীয় ভাবে আইউব ক্ষমতা দখল করেন এবং কালক্রমে কীংবদন্তীর নায়কে পরিনত হন। সম্প্রতি ঢাকাতে স্তআমাদের ভাবনা ও সাহিত্যে কায়দে আজমস্ত শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আইউব খানের গ্রন্থ "প্রভূনয় বন্ধু"র স্মৃতিও হালে লোকরা ভুলতে

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে দলের কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য মোনাজাত করছেন স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ

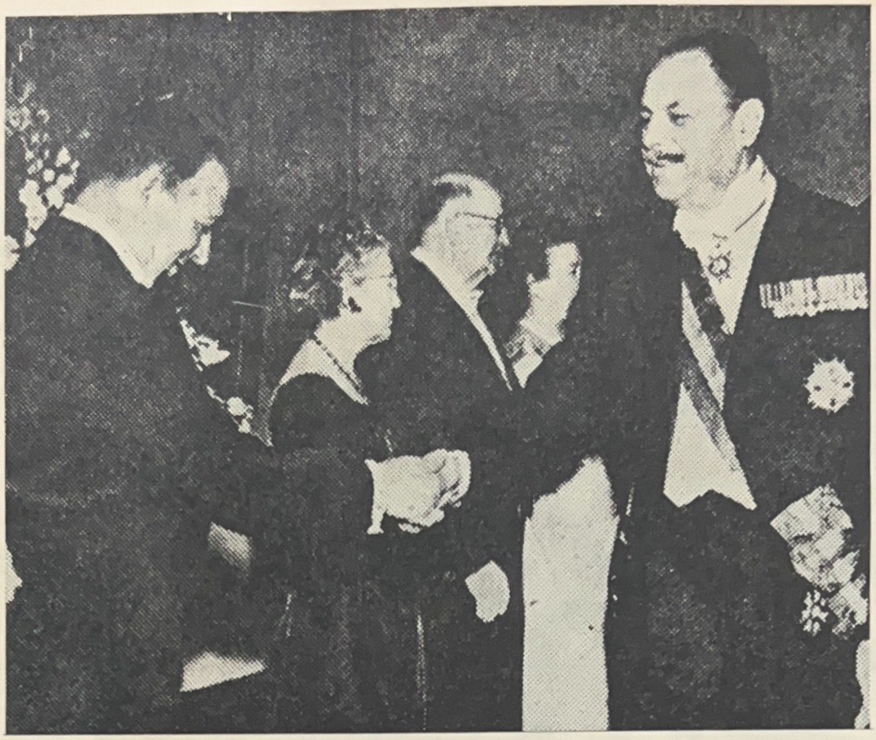

কমন ওয়েলথ্‌-এর এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ফিল্ড মার্শাল আইউব

গনচীনের মহান নেতা মা ও সেতুং-এর সাথে প্রেসিডেন্ট আইউব।

আমি '৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) নিয়োজিত হই এবং '৭৩ সালে ভারতের পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি। আমি এই অঞ্চলকে নিকট থেকে দেখার এবং এখানকার লোকদের মেজাজ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলোকন করার জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছর সময় পেয়েছিলাম। এটা নিঃসন্দেহে পর্যাপ্ত সময়। এ সময়টা ছিল নানা দুর্যোগপূর্ণ। আমার চোখের সামনেই আগরতলা কেসের সূত্রপাত হয় এবং পরে তা চারদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আমি সেই অধম, যে শেখ মুজিবর রহমানকে '৬৮ সালে জেল থেকে মুক্ত করে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। আমার চোখের সামনেই ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল' জারি করা হয় এবং '৭১ সালের সামরিক তৎপরতার সাথে ওতপ্রোতভাবে থেকে সবকিছু দেখার সুযোগ লাভ করি। অবশেষে সেই অভিশপ্ত দিনও দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে, যেদিন উপমহাদেশের সেরা পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয়দের হাতে অস্ত্র সমর্পণ করে।

আমার এ পাঁচ বছরের সময়টাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দু'বছর ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে, বাকী ৩ বছর গভর্নরের ষ্টাফ অফিসার হিসেবে, যা অনেকটা সিভিল এফেয়ার্স-এর নামান্তর। প্রথমদিকে ভাবতাম, পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে এখানকার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ। ফিল্ড মার্শাল আইউব খান এবং তার সুযোগ্য গভর্নর মোনেম খান শাসনদন্ড বেশ ঠিকঠাকই চালাচ্ছেন। কিন্তু এখানে পৌঁছে আমার সে ধারণা পাল্টে যায়। জেনে বিস্মিত হলাম, মোনেম খান বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন ধিকৃত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত। লোকেরা মোনেম খানকে ঘৃণা করতো। তার প্রধান কারণ ছিল, এ লোকটি নিজের ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে আইউব খানের একজন 'নগণ্য খাদেম' হিসেবে পেশ করেছিলেন। কথা বলার সময় প্রায়ই তিনি 'মাই প্রেসিডেন্ট' বলতেন। এ ধরনের তোয়াজবৃত্তির জন্য বাঙ্গালীরা তাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো।

পূর্ব পাকিস্তানে রওয়ানা হবার আগে আমি ভাবতাম, ফিল্ড মার্শাল আইউব খান সেখানে বেশ জনপ্রিয় হবেন। কেননা, তাঁর আমলেই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে। পূর্বে যে উন্নয়ন বাজেট ছ'সাত কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আইউব খান তা বহুগুণে উন্নীত করেন। এতে এতদাঞ্চলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং গ্রামে-গঞ্জে, শহরে আইউব খানের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ পুঁজি বিনিয়োগ অলক্ষ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার এবং নুতন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তা' হলো, দেদার পুঁজি বিনিয়োগের দরুণ পূর্ব পাকিস্তানে এক নতুন মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হলো এবং ক্রমশঃ তা' বেড়েই চললো। কিন্তু ক্রমবর্ধমান এ শ্রেণীর মন ও মানসিকতাকে সুস্থখাদে প্রবাহিত করার জন্য তখন তেমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না।

স্বভাবতঃই বাক-স্বাধীনতা ছিল বন্ধ। ফলে, এ শ্রেণীর লোকদের চিন্তাধারা 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' আশ্রয় নিল। এ শ্রেণী ভাবতে শুরু করলো, ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগের দরুন খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ একটা সুষ্ঠরূপ পরিগ্রহ করেছে। এমতাবস্থায় যদি পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে নেয়া যায়, তা হলে এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো জোরদার হবে। তাছাড়া এ প্রদেশ

স্বাধীন হলে এখানকার যেসব অবাংগালীদের শিল্প–কারখানা আছে, তা সহজেই তাদের হাতে এসে যাবে। অতএব, এভাবে একটা বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ভিত্তি রচনা হবে এবং আলাদীনের জাদুই চেরাগের মতো সকলের ভাগ্য ফিরে যাবে।

পূর্ব পাকিস্তানে আমাকে একটা আর্টিলারী ব্রিগেডের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। প্রথমদিকে বাংগালী সৈন্যদের সাথে আমার তেমন হৃদ্যতা গড়ে উঠেনি। আমার ব্রিগেড সর্বত্র ছড়িয়েছিল। এর একটি ইউনিট ছিল সৈয়দপুরে, একটি কুমিল্লাতে এবং একটি যশোরে। অস্ত্রাগার সম্প্রসারণের জন্য আমাকে প্রায়শঃ এসব ইউনিটগুলোতে যেতে হতো। এখানে এসে আমি সর্বপ্রথম মেজর জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন সমভিব্যাহারে দিনাজপুরে যাই। সেখানকার ডি, সি, ভদ্রলোক ছিলেন হিষ্ট্রিতে এম, এ,। মোজাফফরউদ্দিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বাংগালীদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? ডি. সি. বললেন, আসলে আমরা দারুণ হীনমন্যতায় ভুগছি। বেশীরভাগ বাঙ্গালী উচ্চ বংশসম্ভূত রাজনৈতিক কারণে এদের পূর্ব পুরুষরা উত্তর ভারত থেকে এসে এখানে আশ্রয় নেয়, এরপর এখানে যখন মুসলমানেরা আসে, তাদের সংস্পর্শে এরাও মুসলমান হয় এবং তাদের দ্বারা শাসিত হয়। মোটকথা, এভাবে বহুকাল থেকে আমরা কারো না কারো দ্বারা শাসিত হয়েছি। এমন কি, এখানকার একটি দ্বীপে হাবশীরা পর্যন্ত এসে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে এই ডি. সি. ভদ্রলোক জানালেন।

দিনাজপুরে প্রথম দিনেই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। যে কর্নেল সাহেবের কাছ থেকে আমি চার্জ বুঝে নেব, তিনি রিভলভারসহ আমার সামনে এলেন। শান্তিকালীন সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার কারণ জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানালেন, এখানকার পরিস্থিতি এমনই যে, পিস্তল নিয়ে চলতে হয়। সাথে পিস্তল থাকলে সবাই শান্ত থাকে।

এরপর আমি এও অনুভব করলাম, পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসাররাও বাংগালী অফিসারদের সাথে বড় একটা মেশেন না। ঢাকা ইউনিটে ২–৩ জন বাংগালী অফিসার ছিলেন। তারা অনেকটা আলাদাভাবে থাকতেন, মেসে তারা আলাদা খেতেন। আমি অনেক চেষ্টা করতাম, এরা মিলেমিশে চলুক। কিন্তু আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এদের মাঝে ঘনিষ্ঠতার প্রধান অন্তরায় ছিল– ভাষা। বাংগালী অফিসাররা উর্দূ মোটামুটি বলতে পারতো, কিন্তু আমাদের অফিসাররা বাংলা মোটেও জানতো না। এ–সময় সেনাবাহিনী ছাড়া সিভিলিয়ানদের সাথেও আমার জানাশুনা বাড়তে থাকে। স্টেশন কমান্ডার হিসেবে আমি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার স্কুলগুলোর পরিচালনা বোর্ডের কর্তা ছিলাম। এ সুবাদে আমি যতই বাংগালীদের সংস্পর্শে আসতে লাগলাম, ততই এ বৈষম্যের গূঢ় রহস্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। দিন যতই যেতে লাগল, ততই মনে হতো, এ ভাবে আর চলতে পারে না। ভাষাগত বৈষম্য ছাড়াও আরো একটি কারণ ছিল, তা হলো ভৌগোলিক দূরত্ব। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে যে সব লোকেরা আসতো, তারা হয় বড় সরকারী অফিসার, নয়তো বড় বড় ব্যবসায়ী বা অবস্থাপন্ন লোক। স্বভাবতই এদের জীবনযাত্রা ছিল উন্নত ধরনের। এদের দেখেই বাঙ্গালীরা পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের সম্পর্কে ধারণা নিতো এবং সেখানকার সাধারণ লোকদের

জীবন সম্পর্কে কোন ধারণা নিতে পারতো না। এখানকার লোকেরাও যারা মাঝে-মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতো তারা বড় বড় শহরে থেকে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে ফিরে আসতো। ফলে, ওখানকার শহরের চাকচিক্য দেখেই তারা ধারণা নিতো এবং ঢাকা ফিরে এসে বলতো-আরে, ওরা তো আমেরিকার লোকদের মতো শান-শওকতের সঙ্গে জীবন যাপন করছে। আমাদের রক্ত শোষণ করে ওরা দিন দিন নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিচ্ছে।

দীর্ঘদিনের বঞ্চনা বাঙ্গালীদের মন-মানসিকতাই গড়ে তুলেছিল অন্য ধাঁচে। এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। একবার আমি ক্যামব্রেলা স্টাফ কলেজে যোগ দেই। এই কোর্সে দু'জন হিন্দুও যোগ দেন। এদের মধ্যে একজন ফ্যামিলী নিয়ে এসেছিলেন, সাথে ছিল পুরনো ভৃত্য। সে ভারতে ইংরেজদের রাজকীয় চালচলন প্রত্যক্ষ করেছিল। তার জীবনের এক সিংহভাগ ইংরেজদের সালাম-আদাব জানাবার কাজে ব্যয় হয়েছে। বিলেতে পৌছে এই ভৃত্য যখন ভোরবেলা দেখল-এক ইংরেজ ঝাড়ু দিচ্ছে, দৌড়ে এগিয়ে বাসায় গৃহকর্তীকে বলল, এ কেমন কথাগো, ইংরেজ মানুষ কিনা ঝাড়ু দিচ্ছে। তাকে বুঝিয়ে বলা হলো-এদেশে ইংরেজরাই ঝাড়ু দিয়ে থাকে; কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে তার অনেক কষ্ট হলো। ঠিক এ ধরনেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা পূর্ব পাকিস্তানীদের ও পেয়ে বসেছিল বৈকি। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেরও একশ্রেণীর লোক রটনা করে বেড়াতো, বাঙ্গালীরা ভুখানাঙ্গা, আনকালচারড্- প্রায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা তাদের সহায় সম্পদ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আর তাদের চালচুলো ঠিক করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে মদদ যোগাতে হয়।

মোনেম খানের সাথে আমার প্রায়শঃ কথাবার্তা হতো। প্রত্যেকবারেই আমার মনে হতো, তাঁর মধ্যে কোন সুদৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা বলিষ্ঠ চিন্তাধারা নেই। গায়ের জোরে তিনি শান্তি রচনার প্রয়াসী ছিলেন। তখন শেখ মুজিব জেলে এবং আওয়ামী লীগ অভ্যন্তরীণ গোলযোগের শিকারে পরিণত হয়েছিল। ওদিকে খবরের কাগজেরও কোন স্বাধীনতা ছিল না। এজন্যে প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা নিজেই পথ তৈরি করে নেয়। সবদিকের পথ রূদ্ধ ছিল বলে ছাত্রেরা রাজনীতিতে নেমে পড়ল এবং ক্রমশঃ তাদের ভূমিকা এত তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল যে, পরে দেখা গেল-প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই একেকটা স্টুডেন্ট ফোরাম তৈরি করতে লাগলো।

আমি যখন ঢাকায় পৌছি, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন, এস, এফ-এর রাজত্ব জমে ওঠেছে। এই দল ছিল মোনেম খানের আশীর্বাদপুষ্ট। তিনি এদের দ্বারা শিক্ষাঙ্গনে গুন্ডামী ও নষ্টামীর আমদানী করেন। সব রকম চারিত্রিক দোষ এদের মাঝে পাওয়া যেতো। প্রতিপক্ষ ছাত্রদের এরা নানাভাবে নির্যাতন করতো। বই জ্বালানো এবং কক্ষে আগুন ধরিয়ে দিতেও পিছপা হত না। মোনেম খানের ছত্রছায়ায় এদের কার্যকলাপ এত চরমে পৌছে যে, শেষ পর্যন্ত এদের পতন ঘনিয়ে আসে এবং আওয়ামী লীগের অঙ্গদল ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফেডারেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। ছাত্রদের মন-মানসিকতা অপরিণত ছিল বিধায় সব ব্যাপারেই তারা আন্দোলনের রঙ লাগিয়ে নিতো। এভাবে ক্রমশঃ এখানকার রাজনীতি দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিত্রে অবতীর্ণ হয়।

আমাদের সব কিছুর বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করতে হবে, তা'হলেই আমরা সত্যিকার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের পত্তনই হয়েছিল নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান শক্তিশালী, আর পশ্চিম পাকিস্তান ছিল শিল্প-কারখানার মালিক ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান। শেষে পরিস্থিতি এমন হলো, পূর্ব পাকিস্তান সব ব্যাপারেই রাজনৈতিক মীমাংসা কামনা করতে লাগল। জনসংখ্যার দোহাই দিয়ে তারা দেশে প্রাধান্য কামনা করত। পশ্চিম পাকিস্তান তাদের এসব দাবী-দাওয়ার জবাবে সামরিক অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করতে লাগল। অতএব, যে-কোন পরিস্থিতিতেই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা হয় জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা অথবা মার্শাল ল' জারি করতো। মার্শাল ল' পূর্ব পাকিস্তানের জন্য খুবই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হলো। গণতান্ত্রিক শাসনের সময়ে তাদের কিছু না কিছু সুবিধা দেয়া হতো, কিন্তু সামরিক শাসনের সময় তারা ষোল আনা বঞ্চিত হতো। এ অঞ্চলের লোকদের যখন গুরুত্বহীন কোন মন্ত্রীত্ব দেয়া হতো, তখন তা নিয়েও দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো। এতদসত্বেও কিছু না কিছু সুবিধা তাদের দেয়া হতো এবং বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলের লোকেরা প্রধানমন্ত্রী ও গভর্নর জেনারেল-এর পদ অলংকৃত করেন।

মার্শাল ল' জারি করার পর পূর্ব পাকিস্তানে কোন বাদ-প্রতিবাদ শোনা যেতো না। তার কারণ, মিলিটারীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। কর্ণেল বলুন, আর জেনারেল বলুন, এসব পদে কোন পূর্ব পাকিস্তানী ছিল না। মার্শাল ল'-র পুরো মেশিনারী জুড়ে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা। এটাও একটা বিরাট ক্ষোভের কারণ ছিল তাদের জন্য।

আরো একটি ব্যাপার আমি উপলব্ধি করেছি, তা হলো-পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনীতি এবং প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে বেশী রকম সেকুলার ছিল এবং সাধারণ লোক ছিল ভিন্নতর; অথচ এদের নেতৃত্ব করতো, শিক্ষিত সম্প্রদায়। পূর্ব পাকিস্তানের এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল, অর্থনৈতিক মুক্তিকে নিশ্চিত করার জন্য পাকিস্তানে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা মনে করতো, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানের সৃষ্টি। অবশ্য এই উদ্দেশ্যের মাঝে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাও হয়েছে বৈকি।

বাঙ্গালীদের এই অর্থনীতি সুবিধাপ্রসূত চিন্তাকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং এ ধারা পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা পিপলস্ পার্টি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কেউ এ মতবাদ বিশ্বাস করতো না বা মানতো না। '৭০ সালে প্রথমবার দেশের উভয় অংশে এ ধারণা বদ্ধমূল রূপ পরিগ্রহ করে যে, পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই আসল। বলা বাহুল্য, এ প্রবণতা পাকিস্তান পত্তনের মূল দর্শনকে প্রচন্ড আঘাত হানে। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যে সচেতনতা উত্তরোত্তর বদ্ধি পায়, তার পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর উভয় অংশের অর্থনীতি ছিল অনগ্রসর এবং শিল্প-কারখানা বলতে তেমন কিছু ছিল না। এ-সময় হিন্দুস্তান এবং আফ্রিকা থেকে শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা এসে এখানে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিজ পত্তন করে। দেশের

উভয় অঞ্চলের লোকদের মন ও মানসিকতায় বিচ্ছিন্নতা ছিল বিধায় লোকেরা এই বহিরাগত শিল্পপতিদের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতো। প্রথম দিকে তারা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা স্থাপন করেছে, ওখানকার লোকেরা তাদেরকে মোটামুটি আপন করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানে আগত শিল্পপতিদের তারা আপন করে নিতে পারেনি। সর্বদা তাদেরকে অস্থানীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানী মনে হয়েছিল, যার ফলে এরা নিজেরাই নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানী বলে মনে করতে লাগলো। এর ফলে, তারা তাদের হেড অফিস ঢাকার বদলে করাচীতে স্থাপন করে এবং স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে জমা হতো।

অর্থনৈতিক সমস্যার আরো একটি মুখ্য কারণ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি বিনিয়োগের পরিবেশ ততটা সুবিধাজনক ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে ১০০ টাকার পুঁজি এক বছরে ২০০ টাকায় রূপান্তরিত হতো, পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে হতো ৫০ টাকায়। কেননা, শ্রমিকেরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করতো না এবং মিলকারখানায় আন্দোলনের বাতাস বইছিল। উপরন্তু রাজনীতিকরা নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য উস্কানী দিতো। ফলে, উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। তাছাড়া এটাও লক্ষ্যণীয় ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্য পূর্ব পাকিস্তানে বেশী দামে বিক্রী হতো, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের পণ্য উভয় অংশে একই দামে বিক্রী হতো। এটাও একটা বিরাট প্রতিক্রিয়ার কারণ ছিল।

আমার বেশ মনে আছে, একবার আইউব খান এলেন পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁকে এখানে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানানো হলো, যেন একজন বিদেশী 'শাহেন শাহ' এসেছেন। গভর্নর মোনেম খান তাঁর জন্য এক স্টেজ তৈরী করলেন, যা ছিল খুবই ব্যয়বহুল। ফিল্ড মার্শাল বক্তৃতা করতে উঠে বললেন, এখানকার জনসংখ্যা দিন দিন এতই বেড়ে চলেছে যে, একদিন মানুষ মানুষের মাথা খাবে। চারদিকে দাংগা-হাংগামা ছড়িয়ে পড়বে। সাধারণ লোকেরা প্রত্যক্ষ করল আইউব খানের আগমন উপলক্ষে দেদার 'পাবলিক মানি' খরচ করা হচ্ছে। এ ধরনের আরো একটি ঘটনা আমার মনে আছে। চাঁদপুর জেটি তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটার উদ্বোধন উপলক্ষে ফিল্ড মার্শাল এলেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য যে আয়োজন করা হয়েছিল, তাও বেশ মনে রাখার মতো। যুবতী মেয়েরা মাটির কলসী নিয়ে চমৎকার নৃত্য প্রদর্শন করেছিল। মেয়েদের পোশাক-আসাক ছিল অর্ধনগ্ন। প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য অতিথিদের ওপর মাল্যদান ও পুষ্প বর্ষন চলছিল, এসব দেখে আমার মনে ধিক্কার লাগল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এদিকে জোয়ান মেয়েরা নাচছিল, অপরদিকে সাধারণ দর্শকেরা বলাবলি করছিল, পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। মোনেম খান তাঁর প্রভুকে খুশী করার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। একবার তিনি মাও সেতুং-এর লাল বুকলেটের মতো আইউব খানের বাণী সম্বলিত একটি সবুজ মলাটের বই ছাপিয়ে অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করেছিলেন। সাধারণ লোক মনে করতো আইউব খান নামক আমাদের একজন বিদেশী বাদশাহ আছেন এবং মোনেম খান হচ্ছেন তাঁর অনুগত সুবেদার।

গনচীনের প্রিমিয়ার হুয়া কুয়া ফেং এর সাথে শহীদ জিয়া (২১. ৭. ৮০)

প্রেসিডেন্ট জিয়া ও ফিডেল ক্যাস্ট্রো

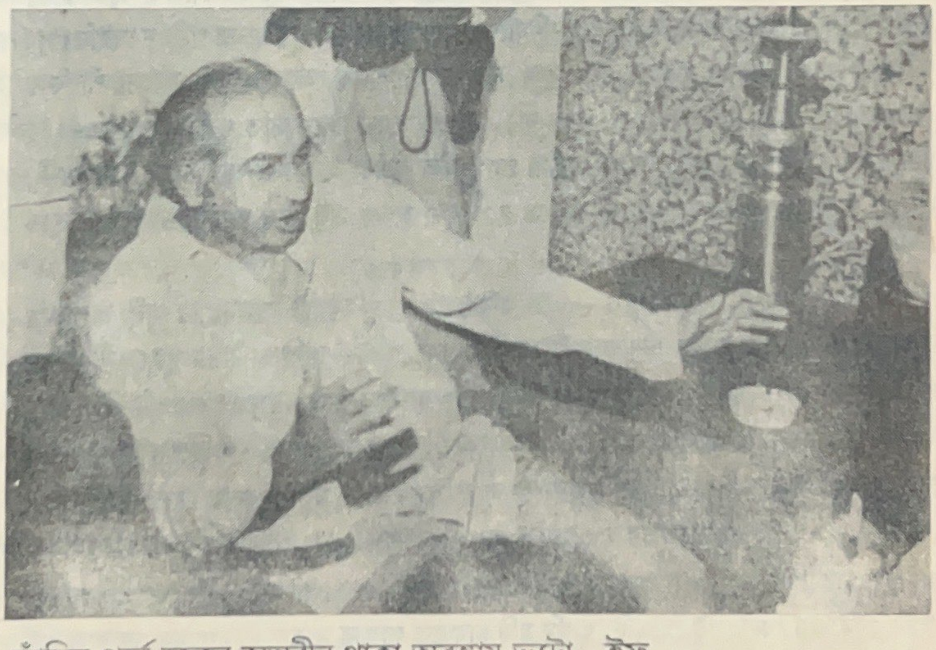

ফাঁসির পূর্বে জেলে অন্তরীন থাকা অবস্থায় ভূট্টো ইফ আইএম এসাসিনেটেড শিরোনামে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন, পরবর্তী কালে বাংলা সহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে তা প্রকাশ লাভ করে

পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার আরো একটি দিক ছিল, আর তা হলো–প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক এডমিনিস্ট্রেশনের উচ্চ পদগুলোতে বাংগালীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না বললেই চলে। দেশ বিভাগের পূর্বে এ, কে, ফজলুল হক যখন মন্ত্রীসভার পত্তন করেন, তখন নিম্ন পদগুলোতে অসংখ্য বাংগালীর চাকুরী হয়েছিল; কিন্তু উচ্চপদে কোন বাংগালীকে সুযোগ দেয়া হয়নি। পাকিস্তান হবার পর বাংগালীদের বাসনা ছিল, সরকারী ফ্লাগ কারে চড়বে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হলো না। তার বদলে দেখা গেল, ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার চলে গেলে সেখানে স্থান করে নিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী ডেপুটি কমিশনার। এই নতুন ডেপুটি কমিশনারদের চাল–চলনও ছিল অনেকটা ইংরেজদের কাছাকাছি। ইংরেজ শাসিত এখানকার মানুষ ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতো–মাঝখানে ইংরেজ চলে গেলে তাদের সেই ক্রোধ বা ঘৃণা গিয়ে নিপতিত হলো এই নব্য অফিসারদের উপর, যারা ছিল পাকিস্তানী এবং তাদের ভাই। পাকিস্তানী অফিসারদের ব্যক্তিগতভাবে কোন অপরাধ ছিল না। দেশ বিভাগের পর প্রমোশনের প্রশ্ন যখন এসেছে, এস্টাবলিশমেন্টের তালিকায় বাংগালীদের নাম ছিল না। ফলে, এসব অফিসাররা সংগতভাবে পদোন্নতি নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিল। উচ্চপদে বাংগালীদের এই বঞ্চনার কথা চিন্তা করে ইয়াহিয়া খান প্রচলিত নিয়ম লংঘন করে ৭ জন বাংগালীকে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী বানিয়েছিলেন। কিন্তু এই পদক্ষেপ এমন এক সময় হয়েছে, যখন প্রতিহিংসার দাবানল চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার বলতে দ্বিধা নেই, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে আমরা সুস্থ মনের পরিচয় দেইনি। পূর্ব পাকিস্তানীদের আমরা সাধারণভাবে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছি। ভেবেছি, এই কালো শীর্ণকায় লোকগুলোর জাত–বংশ ভাল হতে পারে না। এরা সারা হাতে মেখে ভাত খায়। গায়ের রং–এ কি আসে যায়। মানুষ হিসেবেই তাদের মর্যাদা প্রাপ্য ছিল। তারা আমাদের ভাই, তারা পাকিস্তানী, তাদের সাথে মিলেমিশে আমাদের থাকতে হবে–যথা সময়ে এই মন্ত্রে আমরা উজ্জীবিত হতে পারিনি।

রাজধানী ছিল অনেক দূরে – এটা ঘনিষ্ঠতার প্রশ্নে বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালীদের অভিযোগ দিন দিন বেড়েই চলছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের বুরুক্রেসী প্রেম–ভালবাসার সকল নিগড় বিনষ্ট করে দিয়েছিল। ইংরেজ আমলে ভারতের দুটো রাজধানী ছিল, দিল্লী এবং শিমলা। আমরা এক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতাকে কেন কাজে লাগাইনি? বিশেষ ভৌগোলিক বৈসাদৃশ্যকে সামনে রেখে বছরের ছ'মাস ইসলামাবাদে এবং ছ'মাস ঢাকাতে রাজধানী চালানো যেতো। এই সিষ্টেম চালু হওয়ার পর আস্তে আস্তে দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দফতর ছাড়া সকল মিনিস্ট্রি ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা যেতো। এভাবেই উভয় অঞ্চলের মাঝে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হতো। আমার নিজের বেলাতেই দেখেছি, আমি যদি ঢাকাতে থাকার সুযোগ না পেতাম, তাহলে এই অঞ্চলের লোকদের জীবন এবং চিন্তাভাবনার সঠিক চিত্র আমি পেতাম না। আমি ও অন্যান্য পাকিস্তানীদের মতো তাদেরকে ভুল বুঝতাম। পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্যে ইসলামী ভাবাবেগ সবচাইতে বেশী কার্যকর ছিল। কিন্তু আমি যতটুকু পর্যালোচনা করে দেখেছি, দেশের দুই অংশের

ইসলামী দৃষ্টিভংগির মধ্যেও বিভিন্নতা ছিল। ইসলামী অনুশীলনের বাহ্যিক রূপ পূর্ব পাকিস্তানেই বেশী দৃষ্ট হয়েছে। এখানকার লোকেরা নামাজ-রোজায় অবশ্য খুব পটু। বেশ মনে আছে, গভর্নর হাউসে যখন কোন সরকারী মিটিং হতো, বাংগালী অফিসাররা মিটিং-এর মাঝখানেই নামাজ পড়ার জন্য উঠে চলে যেতেন। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ চীফ্ সেক্রেটারী জনাব শফিউল আজম (স্বাধীনতা আন্দোলনে যার বিরাট ভূমিকা রয়েছে) নামাজের সময় হলে সব কাজ রেখে উঠে যেতেন। মোনেম খানও অনেকটা সেধরনের ছিলেন। এ ধরনের ইসলামী পাবন্দ লোক পশ্চিম পাকিস্তানে কমই দেখা যেতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের ইসলামী মূল্য-বোধের পরাকাষ্ঠা ছিল। আধুনিক ইসলামী প্রজ্ঞায় তাদের গতায়ত ছিল অনেক গভীরে। উভয় অঞ্চলের ইসলামী ভাবাবেগের এই পার্থক্যের মূলে কিছু কারণ ছিল, আর তা হলো বাংগালীরা সাধারণত বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলামকে জানতে বুঝতে শিখেছে। এটা সর্বজনবিদিত, বাংলা ভাষায় ইসলামী চর্চা হয়েছে সামান্য এবং বাংলা ভাষাতে রয়েছে হিন্দী এবং সংস্কৃত শব্দের আধিক্য।

আমি ওখানকার অনেক মৌলভীদের আল্লার বাংলা 'প্রভু' করতে শুনেছি। অথচ আল্লা এবং প্রভুতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুশীলনের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল সেকুলার। অনেক ধর্মভীরু লোকও ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ, ওখানকার পিডিপিও সেকুলারের প্রবক্তা ছিল। জনাব নূরুল আমিনও সেকুলার ছিলেন। মুসলিম লীগের মাঝেও ইসলামী প্রজ্ঞার চর্চা ততটা ছিল না। অবশ্য জামাতে ইসলামীর কথা আলাদা, কিন্তু এই পন্থীদের সংখ্যা ছিল নেহাত সীমিত। পশ্চিম পাকিস্তানে রছুলে করিম (দঃ) সম্পর্কে কোন বিরূপ বক্তব্য কোন লোকই সহ্য করবে না। দরকার হলে এজন্য প্রাণও দেবে। কিন্তু এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা অনেকটা সহনশীল। আমি জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক রছুল (দঃ) সম্পর্কে ক্লাশে বিরূপ মন্তব্য করে এবং এ ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে কোন প্রতিবাদ ওঠেনি, তা নিয়ে বরং বেশ হাসি মজা হয়েছিল। আপনারা জানেন, আবদুল মালেককে কেন প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছিল। সে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার প্রবর্তন চেয়েছিল। এই দাবীর বিনিময়ে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। উভয় অংশের মানসিকতার এই পার্থক্যের মধ্যে অনাগত দিনের প্রলয় বিষাণ বাজছিল।

এটা ঐতিহাসিক সত্য, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা যখন উর্দু বলি, তখন সচেষ্ট থাকি কিভাবে এই ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফুটিয়ে তুলতে পারি। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রধান স্থপতি হলো হিন্দু সম্প্রদায়। স্বভাবতইঃ এর বড় বড় কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য যে পরিবেশে লালিত হয়েছে, সেখানে মুসলমানী রীতিনীতি ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত।

লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। জাতীয় জীবনে এত বড় একটা

বিপ্লব বা বিপর্যয় এমনিতে তো আর আসেনি। প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বে সাহিত্য এবং ইতিহাসের দ্বারা মুসলমানদের অনেক সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে। প্রথমেই বাংলা সাহিত্যে এমন সব নাটক-নভেল লেখা হলো, যেখানে মুসলমানদের চিত্র ছিল অনুপস্থিত, মনস্তাত্বিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে ইতিহাসের সূত্র টেনে এনে বলা হলো, যত মুসলমান রাজা-বাদশা বাংলাদেশ শাসন করেছে, তারা সকলেই বাংগালীদের শোষণ করেছে, বঞ্চিত করেছে। পাঠান-মোঘল কেউই এদের রেহাই দেয়নি। বাংগালীদের মুসলমান হয়ে কোন লাভই হলো না। আমি বলি গল্প-উপন্যাস এবং নাটকে মুসলমান রাজা বাদশাদের চরিত্র বিকৃত করা হয়েছে এবং এভাবে পুরো ইতিহাসই বিকৃত করে রাখা হয়েছে। ফলে, এসব বই-পুস্তক পড়ে নব্য সমাজের মন-মানসিকতা গড়ে উঠেছে এবং মুসলমানদের হৃত গৌরবের কথা ভুলে গিয়ে তারা হিন্দু দেবদেবীর কাহিনীতে নিমজ্জিত হয়েছিল।

আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছি, তখন এখানকার মনমানসিকতা ও সামাজিক বিপর্যয় এক বিপজ্জনক বাঁকে উপনীত হয়েছিল। আমাকে একদিন জেনারেল মোজাফফর উদ্দিন ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, এক জরুরী আলোচনা আছে। এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এতে সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যও জড়িত রয়েছে। প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো, কর্ণেল ওসমানীকে গ্রেফতার করা যেতে পারে। আমি তখনও আগরতলা ষড়যন্ত্র কেস সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। ওসমানীকে আমি ভালভাবেই জানতাম। আমার মতে তাকে যদি গ্রেফতার করা হয়, তাহলে বাংগালী জাতীয়তাবাদের পূজারী বাংগালী ইউনিটগুলোতে অসন্তোষ দেখা দেবে।

অবশেষে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ণেল ওসমানীকে গ্রেফতার করা হলো এবং প্রেসনোট ইস্যু করা হলো, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। আমার মতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই পাকিস্তানের ঐক্যে ফাটল ধরাবার প্রধান কারণ ছিল।

সরকারের লোকেরা অনেক সময় সাধারণ লোকদের চিন্তাভাবনাকে একেবারেই উপেক্ষা করেন। শেখ মুজিব সম্পর্কে যখন সরকার আগরতলা মামলা শুরু করে তখন সর্বত্র ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে, শেখ মুজিব আসলে বিরাট লোক। বিরাট না হলে সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা চালায়? গোটা সরকারী মেশিনারী তার বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকে! এই ধারণা শেখ মুজিবের ইমেজকে গগণচুম্বি করে দেয়। এরপর তার চর্চা যেমন দেশে হতে লাগল, তেমনি বিদেশেও। দেখতে দেখতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি লোক শেখ মুজিবকে একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব মনে করে তার পেছনে জড়ো হতে থাকে। ওদিকে আগরতলা মামলা নিয়ে স্থানীয় প্রেস যে অতিরঞ্জিত করলো, তা আর বলাই বাহুল্য। মামলা খোলা আদালতে চলছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মন্তব্য করে বসল, পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের উপর জুলুম করছে এবং আমরা নানাভাবে নির্যাতিত। শেখ মুজিবর রহমান এই মামলার সুবাদে এমন এক রাজনৈতিক ফোরাম পেয়ে গেলেন, যা পূর্বে পাননি।

এই মামলার সাক্ষী এবং অভিযুক্তদের বিবরণ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এমনভাবে ফলাও করা হলো যা পড়ে পড়ে জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল এবং শেখ মুজিবর রহমান তাদের হিরো হয়ে গেল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রাক্কালে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের

ডাইরেক্টর মেজর জেনারেল আকবর খান-এর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন, দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে এই ষড়যন্ত্র, দেখবেন লোকেরা এসব ষড়যন্ত্রকারীদের পিটিয়ে মারবে। আমি জবাবে বললাম, আপনার ধারণা মাঠে মারা যাবে, এখানকার পরিস্থিতি আপনি মোটেই জানেন না দেখছি। এ মামলাটি জনসাধারণের ওপর আরো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এ জন্যে যে, এ মামলার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জজ এবং উকিল আমদানী করা হয়েছিল। আবার এরই মধ্যে এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক একজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যের গুলিতে নিহত হন। এবারে বাংগালীদের অসন্তোষ একেবারে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো।

১৯৬৮ সালের নভেম্বরে প্রথম পশ্চিম পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলো ! কিন্তু এর কোন প্রতিক্রিয়া পূর্বাঞ্চলে পড়লো না। পূর্ব পাকিস্তানীরা হয়ত তখন ভাবছিল আইউব খান নিজের এলাকাতেই প্রথম শেষ হয়ে যাক, পরে আমরা ব্যাপক আন্দোলন করব। হলোও তাই। মুসলমানদের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বহুবার হয়েছে, কেন্দ্র যখন দুর্বল হয়েছে, তখন প্রদেশগুলো স্বাধীকার দাবী করে বসেছে। জানি না, আমাদের রাজনীতিকরা এ সত্যকে কতটুকু আমল দেন। তারা জেনেশুনে তখন কেন্দ্রকে আঘাত হানে। আমি মনে করি, তখন যদি পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন না হতো, তাহলে পূর্বাঞ্চলের আন্দোলনও দানাবেঁধে উঠতো না। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এ সময় বন্ধু শত্রু দু'জনের দৃষ্টিই মওলানা ভাসানীর উপর নিপতিত হলো। অর্থাৎ ভূট্টো এবং আইউব খান পুর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টির পক্ষপাতি ছিলেন, যাতে পুরো দেশে মার্শাল ল' জারী করা যায়।

এটা সর্বজনবিদিত যে, একদা আইউব খান ভূট্টোর প্রতি স্নেহ- ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূট্টো-আইউবের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলো কেমন করে? এর একটা কারন হলো, ভূট্টো একজন জাত পলিটিশিয়ান এবং তিনি দেশের প্রধান কর্ণধার হওয়ার বাসনা পোষণ করতেন। আইউব খান যে পরিস্থিতিতে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তা সকলেরই জানা আছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো নড়বড় হয়ে পড়েছিল, যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে যেতে পারতো। আইউব খান পরিস্থিতি সামলে নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োগ করে পাকিস্তানকে উন্নতির উচ্চ শিখরে তোলেন, দেশের উন্নয়ন তৎপরতা এতখানি ত্বরান্বিত হয়েছিল যে, বিশ্ব ব্যাংক-এর রিপোর্টে পাকিস্তানকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ রিপোর্ট পড়ে অন্যান্য দেশের লোকেরা বলতো, আহ, যদি আমরাও একজন আইউব খান পেতাম।

আমদের সকল উন্নয়নের মুলে ছিল মার্কিন সাহায্য, এতে অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়াও সামরিক সাহায্যও ছিল। পাকিস্তানের ৪ ডিভিশন সৈন্যের বেতন আমেরিকা বহন করতো। আইউব খান আইসেন হাওয়ারকে বলেছিলেন, এত সৈন্য পোষবার শক্তি আমার নেই, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আমি সৈন্য বাহিনী সংকুচিত করতে চাই। আইসেন হাওয়ার তখন পিঠচাপড়ে বলে ছিলেন, সেনাবাহিনী সংকুচিত করার দরকার নেই, আমি এদের খোর-পোষের দায়িত্ব নিচ্ছি। আইউব

খানের নেতৃত্বে এভাবে যখন দেশের শনৈ শনৈ উন্নতি হচ্ছিল, এর মধ্যে কোন রাস্তা বের করে ভূট্টোর বেরিয়ে আসার উপায় ছিল না। ভূট্টো বললেন, এখন কোনমতে যদি পাক–মার্কিন সম্পর্ক নষ্ট করা যায়, তাহলেই উন্নতি ব্যাহত হবে এবং আইউব খান জনপ্রিয়তা হারাবেন। এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে ভূট্টো সন্তর্পণে এবং কৌশলে চীন এবং রাশিয়ার সাথে বেশী মাখামাখি শুরু করেন। এ–ব্যাপারে আমেরিকার সাথে কোনরূপ ভারসাম্য বজায় না রাখাতে স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা অসন্তুষ্ট হতে লাগল। এর ফলশ্রুতিতেই চীন এবং ভারতের সম্পর্ক বিগড়ে যায় এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে আমেরিকা ভারতকে সামরিক সাহায্য দেয় এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি বিগড়ে যায়। দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে, এ সময় মার্কিন প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটে এবং কেনেডী ক্ষমতায় আসেন। কেনেডী ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির লোক, এ জন্য স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের বদলে ভারতের দিকে তার মনোযোগ ছিলো বেশী। বৃটেনের অবস্থাও অনেকটা এ ধরনের ছিল। লেবার পার্টি ভারত এবং কনজার্ভেটিভ পার্টি পাকিস্তানের প্রতি অনুরক্ত ছিল। অতএব কেনেডী প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর পণ্ডিত নেহেরু পুরোপুরি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। মার্কিন সাহায্যে ভারত সয়লাব হতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বলে বেড়াতে লাগল, আমরা কি দোষ করেছি, আমাদের–কেও সাহায্য দাও। ব্যাপারটি নিয়ে হৈ চৈ করাতে মার্কিন প্রশাসনদবিরক্ত হয়। আমেরিকা পুর্বেকার সামরিক সাহায্য কমিয়ে দেয় এবং শেষ অবধি তা একেবারে বন্ধ করে দেয়।

ভূট্টোর প্রথম পরিকল্পনা কার্যকর হয় এবং এভাবে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায় অবতীর্ণ হন। '৬৫ সালের পাকভারত যুদ্ধের পেছনে ভূট্টোর ২য় পরিকল্পনা কাজ করেছিল বলে আমরা মনে করি। পাকিস্তান এবং ভারতের সামারিক শক্তির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল বিরাট। পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ ডিভিশনের মতো এবং ভারতের ষোল ডিভিশণ সশস্ত্র সৈন্য ছিল। আমাদের পাঁচ ডিভিশন সৈন্য বড়জোর ভারতের আট ডিভিশনের মোকাবিলা করতে পারতো। বাকী ৮ ডিভিশন তখন নির্বিবাদে পাকিস্তানে ঢুকে পড়তো — তাদেরকে ঠেকাবার কোন শক্তি ছিল না আমাদের। সম্পূর্ণ পরিকল্পিত উপায়ে কাশ্মীরে একটা সংঘর্ষের প্রস্তুতি চলছিল। প্রথমে অধিকৃত কাশ্মীরে গেরিলা প্রেরণ করা হবে, এই ছিল পরিকল্পনা। কাশ্মীরে স্থানীয়দের সাথে পাকাপোক্ত যোগসাজস না করে গেরিলা পাঠানো রাজনৈতিক বা সামরিক দিক থেকে আত্মঘাতির শামিল ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হলো। সম্ভবতঃ নেপথ্য উদ্দেশ্য এই ছিল, গেরিলা অপারেশন শুরু হলেই ভারত পাকিস্তানের ওপর হামলা করবে এবং নিঃসন্দেহে পাকিস্তানী সৈন্য পরাজিত হবে এবং আইউবের খপ্পর থেকে দেশ মুক্ত হবে। এই ষড়যন্ত্রকে লুকাবার জন্য ভূট্টো আইউব খানকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, এই অপারেশনের কারণে ভারত কোনদিনই পাকিস্তান আক্রমণ করবে না – এ ব্যাপারে আমেরিকা আমাকে কথা দিয়েছে।

এ–ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু জানতাম, অবগতির জন্য পাঠকদের খেদমতে তা নিবেদন করতে চাই। ব্যাপারটা ঘটেছিল এভাবে, পররাষ্ট্র সচিব জনাব আজিজ আহ্‌মদ আইউব খানকে এক চিঠি লিখে জানালেন, বিভিন্ন মহল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে

বলে–ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করবে না, এ ধরণের একটা নিশ্চয়তা নাকি দেয়া হয়েছে–আসলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ধরণের কোন নিশ্চয়তা দেয়নি। আমি এ সময় ডি, এম, ও, হিসাবে কর্মরত ছিলাম। প্রেসিডেন্ট আইউব আজিজ অহ্‌মদের এই চিঠি আমাকে দেখালেন, আমি মনোযোগের সাথে তা দেখলাম, নিচে প্রেসিডেন্ট আইউব নিজের হাতে ইংরেজীতে লিখলেন, "ইওর ফরেন মিনিস্টার টোল্ড আস ইন এম, ও. রুম অন ফিফ্‌থ সেপ্টেম্বর দ্যাট ইন্ডিয়া উইল নট্ এ্যাটাক্ পাকিস্তান।"

প্রেসিডেন্ট কেনেডী আইউব খানের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ সে কালে আইউব খানের ব্যক্তিত্ব সারা বিশ্বে বেশ ফলাও করে দেখানো হতো। কিছুটা অহমিকতা নিয়ে তিনি একবার কেনেডীর সাথে কথাবার্তা বলেন, সম্ভবতঃ কেনেডীর তা পছন্দ হয়নি। এ জন্যে তিনি আইউবের দম্ভ খাটো করার (কাট্ টু সাইজ) মনোবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং অনেকটা ধোকা দেয়ার জন্য হয়ত ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করবে না বলে নিশ্চয়তার বাণী আওড়িয়েছেন।

সেপ্টেম্বর যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রভূত অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে ভারতকে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার বাইরে এগোতে দেয়া হয়নি। পাকিস্তান বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো এবং এভাবে আইউব খান দুর্বল হয়ে গেলেন। অবলীলাক্রমে ভূট্টো এভাবে পরবর্তী তাসখন্দ ঘটনাকে রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করলেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের 'ইমেজ' তখন বেশ উঁচুতে উঠে গিয়েছিল, এজন্য পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে ভূট্টোকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এবার আসুন পূর্বপাকিস্তানের ঘটনাবলীতে।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম গোলযোগ সৃষ্টি হয় '৬৯ সালের ২০ শে জানুয়ারী। আন্দোলনের কারণ পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করেন মওলানা ভাসানী। সূত্রপাতের কাহিনী খুবই চমকপ্রদ এবং এতে অনুধাবন করার অনেক কিছু আছে। ভাসানী দাবী করলেন, গভর্নর হাউজের সামনের রাস্তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হোক। একটা ছোট মিছিল এসে এই রাস্তায় হানা দিল। পুলিশ বাঁধা দিলে মিছিল তাকে আক্রমণ করলো। পুলিশ পালাবার জন্য একটা পানের দোকানে আশ্রয় নিল, তারপরও তাকে রেহাই দেয়া হলো না। বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য পুলিশ বেচারী গুলি চালাল, ফলে একজন লোক মারা গেল। আর চাই কি এর পরে কেয়ামত কান্ড ! মিছিলকারীরা এ ধরণের একটা পরিণতির আশা করছিল, যাতে একটা লাশ নিয়ে মিছিল করা যায়। পূর্ব পাকিস্তানে এভাবে লাশের প্রদর্শনী হতো। লাশ নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করা হতো। দেহের যে অংশে রক্ত ঝরছে, তা বের করে রাখা হতো। রক্তমাখা কাপড়–চোপড়ও প্রদর্শন করা হতো। মিছিলে অসংখ্য লোক হতো, কিন্তু এই শহীদের জানাযায় শরীক হতো মাত্র গুটি কয়েক লোক। এই ঘটনার পরদিন গভর্নর হাউজের সামনের রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এ সময় শেখ মুজিব আগরতলা মামলায় বন্দী। 'আওয়ামী লীগের' পক্ষ থেকে 'স্টুডেন্ট ফোরাম' এই আন্দোলনে নেমে পড়লো এবং এক এ্যাকশন কমিটি গঠন করল।

দেখতে দেখতে এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমদিকে মোনেম খানের বিরুদ্ধে

শ্লোগান দেয়া হতো, 'মোনেম, খান, গদি ছাড়ো–পরে আইউব খানের নামেও শ্লোগান চলতে লাগলো! আমি এই সময় আর্টিলারী ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। ঢাকার শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাকে ঢাকাতে ৩টি ইন্‌ফেন্ট্রি বেটেলিয়ান দেয়া হলো এবং গভর্নরের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

গভর্নর হাউজে তখন আমি কি সব দেখেছি, তা বর্ণনা করার জন্য আরো আয়ুর প্রয়োজন। কিন্তু আপাততঃ দু' একটি ঘটনা বলে শেষ করতে চাই। গভর্নর মোনেম খান সারারাত জাগতেন এবং দিনে দেড়টা পর্যন্ত ঘুমাতেন। গভর্নর হাউজের এক কন্‌ফারেন্সের কথা আমি কোনদিন ভুলবো না। সেটা ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারীর রাত। এই দিন ছিল ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস। এই দিনে সারাদেশের লোকদের 'মুডই' থাকে অন্য রকম। ঢাকার পথে–ঘাটে তরুণী মেয়েরা নেমে পড়ে দলে দলে। খালি পায়ে প্রভাত ফেরীতে বেরোয়। পথে আল্পনা আঁকে। শহীদের মাজারে মিলাদ বা মোনাজাত না করে হিন্দু রীতিতে ফুল দিয়ে পূজা করা হয়।

এই রাতে গভর্নর হাউজে দশটার সময় মিটিং বসে। উদ্দেশ্য, এই দিনে ১৪৪ ধারা তুলে নেয়া হবে কিনা। রাতভর আমাদের শলা–পরামর্শ চলল। এভাবে ভোর ৫টা বাজল, কিন্তু কোন ফয়সালা হলো না। শেষে এই ফয়সালা হলো, এখন ফয়সালা করার আর সময় নেই। কারণ ততক্ষনে খবরের কাগজ ছেপে বেরিয়ে গেছে। রেডিওর মাধ্যমেও কোন সিদ্ধান্ত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়।

মিছিল এবং সভা সমিতির হিড়িক বেড়েই চলেছে। উত্তেজনা ও অসন্তোষ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এ সময় আমি সারাদিন হেলিকাপ্টারে চড়ে শহর প্রদক্ষিণ করতাম এবং কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য 'মেসেজ' দিতাম। একদিন সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দেখি, সন্ধ্যার আগেই সভা–মিছিল ভেংগে গেছে। মওলানা ভাসানী একটা বেবী টেক্সীতে চড়ে মিটিং ত্যাগ করছেন, আর তার পেছনে মিছিলের উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে। কিছু দূর এগিয়ে হাতের মশাল থেকে এরা ক'টা ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলো। এ দৃশ্য দেখেই আমি জেনারেল মোজাফফরউদ্দিনকে 'মেসেজ' দিলাম, শহরে আগুন লেগেছে! জেনারেল মোজাফফরকে এক বিশেষ জায়গায় থাকবার জন্য বলে আমি সেখানে অবতরণ করলাম। বললাম, শহরে যা অবস্থা, দ্রুত একটা ইউনিট পাঠানো দরকার। জেনারেল বললেন, যতক্ষণ বেসামরিক প্রশাসন আমাদের কাছে সৈন্য তবল না করবে, গায়ে পড়ে আমরা কি করে সৈন্য পাঠাব?

আমার পীড়াপীড়িতে জেনারেল মোজাফ্‌ফর ডি. সি. কে টেলিফোন করলেন। ডি. সি. জবাবে বললেন, পরিস্থিতি আয়ত্বাধীনে আছে, সেনাবাহিনী তলবের প্রয়োজন নেই। সম্ভবতঃ এ সময় আনোয়ার পাশা ডি. সি. ছিলেন। আমি এতেও নিশ্চিত হলাম না। আমি বললাম, স্যার, আপনি ডি. সি.র সাথে কথা বলুন, আমি আমার ব্রিগেডকে ঘটনাস্থলে পাঠাই। আমি তাই করলাম। সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আমার ব্রিগেড ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করলো। একটু দেরী হলে এলাকা পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। তবুও দশটা বাড়ীতে আগুন জ্বলছিল। এর মধ্যে দুটো জ্বলন্ত

বাড়ী আমি নিজে দেখেছি। দু'টো বাড়ীর একটি ছিল জাস্টিস্‌এস, এ রহমানের বাড়ী। আমি যেয়ে দেখি, স্বয়ং জাস্টিজ সাহেব 'স্লিপিং স্যুট' পরে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে এবং তাঁর ফ্যামিলিকে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দেই। এ সময় আমি জানতে পারলাম, নওয়াব অব ঢাকার বাড়ীতেও আগুন লেগেছে। তার বাড়ীতে কয়েকটা রাইফেল ছিল, কিন্তু যথাসময়ে তা কাজে লাগাতে পারেননি। যাহোক, আমি এখানকার পরিস্থিতি আয়ত্বে আনলাম। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির জন্য পরদিন শহরে কার্ফু জারি করা হলো, আর সেনাবাহিনী শহরে টহল দিতে লাগল। দু'এক জায়গায় ফায়ারিং-এর রিপোর্ট ও পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে গুজব উঠে গেল, কয়েকজন বাংগালী নিহত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে খবর এলো, মিলিটারীর গুলিতে শুধু এক দুগ্ধ পোষ্য শিশু নিহত হয়েছে। এ খবর শোনার পর আমিও দুঃখিত হলাম। তাড়াতাড়ি প্রকৃত ঘটনা তদন্তের জন্য হুকুম দিলাম। পুরো ব্যাপারটা পরে জ্যানতে পারলাম। কয়েক ঘন্টার পর তখন কার্ফুর বিরতি দেয়া হলো, এই সুযোগে দাংগাকারীরা একত্রিত হয়ে শহরের মাঝ দিয়ে আগত ঢাকাগামী একটি ট্রেনের পথ রোধ করে ট্রেন এবং যাত্রীদের তছনছ করে। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য গুলি চালাতে হয়। ঘটনাস্থলে এই গুলিতে কারোই কোন ক্ষতি হয়নি। তবে গুলি ফসকে গিয়ে কয়েক মাইল দূরে এক শিশুর গায়ে লাগে। এটাকে দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে, এতে কারো কোন হাত ছিল না।

পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ যখন বিনষ্ট হয়, তখন নানাধরণের কাহিনীর সূত্রপাত হয়। বিজ্ঞ লোকেরাও তখন তা বিশ্বাস করে ফেলেন। আমার বেশ মনে আছে, জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমদিকে নুরুল আমীন অভিযোগ করে বসলেন, সেনাবাহিনী বাংগালীদের মেরে গোপনে একত্রিত করে মাটিতে পুতে রাখে। কোন দাফন-কাফন ছাড়াই তাদেরকে এভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে! এর জবাবে জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন বললেন- চলুন, কোথায় মানুষ পুতে রাখা হয়েছে, দেখিয়ে দিন। যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলে এর উত্তম সাজা হবে। প্রকৃতপক্ষে গুজব এজন্য বেশী ছড়াত যে, খবরের কাগজ ও প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা প্রকৃত ঘটনা জানা যেত না। আন্দোলনের সময় খবরের ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছিল। ফলে, প্রকৃত ঘটনার রিপোর্ট থেকে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এভাবে ক্রমশঃ মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের চিন্তাভাবনা গুজবে আশ্রয় নেয়। আমি সেকালে এটা তীব্রভাবে অনুভব করি যে, সেকালে খবরের কাগজের মাধমে যতবেশী কৃত্রিমতা পেশ করা হয়েছে, জনগণের মধ্যে ততবেশী অনাস্থা ও অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। জনগণ মশাল মিছিল এবং সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছিল। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য সেনাবাহিনী জুলুম করছিল। কিন্তু রেডিও বা পত্র-পত্রিকায় এর কোনই স্বীকৃতি ছিল না।

ফিল্ড মার্শাল আইউব খান এর সুরাহার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের 'গোলটেবিল বৈঠক' আহ্বান করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বলে বসলেন, শেখ মুজিব ছাড়া আমরা বৈঠকে বসব না। এই দাবীর দরুশ শেখ মুজিব 'লিডারে আজম' হয়ে গেলেন। তার স্থান আরো উঁচুতে উঠে গেল।

জেনারেল মোজাফফরউদ্দিনকে ইসলামাবাদ থেকে গোপনে খবর দেয়া হলো, শেখ

মুজিবকে যেভাবেই হোক, পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাবার চেষ্টা করুণ। জেনারেল সাহেব শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন। শেখ মুজিব জানালেন, এটা নিশ্চিত জানবেন, আমি প্রেসিডেন্ট আইউবের খেদমত করতে চাই। বিশ্বে তার মত একজন প্রেসিডেন্ট বিরল। এজন্যে আমি জামিনও প্রার্থনা করিনা, আমি বন্দী অবস্থায়ই ইসলামাবাদ যাব। শেখ মুজিবের এই স্বীকারোক্তি ফিল্ড মার্শাল পর্যন্ত পৌছানো হলো।

প্রোগ্রাম তৈরী করা হলো– শেখ মুজিব গোপনে রাওয়ালপিন্ডি যাবেন এবং বৈঠক শেষে গোপনে দেশে ফিরবেন।

মুজিবের প্রতিপক্ষ লোক ছিল বলে খবরটা আর গোপন থাকলো না। সম্ভবতঃ খাজা শাহাবুদ্দিন–এর মাধ্যমে এ খবরটা রাজনীতিকদের কান পর্যন্ত পৌছে এবং মৌলভী ফরিদ আহমদ এটা নিয়ে একেবারে হাঁটে হাঁড়ি ভেংগে দিলেন। ফলে সম্পূর্ণ প্রোগাম গোলমাল হয়ে গেল। এ খবর যখন পত্র–পত্রিকায় ছাপা হলো, মুজিব এবারে বেঁকে বসলেন এবং বললেন–আমি বন্দী অবস্থায় কোনক্রমেই পিন্ডি যাবো না। আমাকে আগে ছেড়ে দাও, তবে আমি যাব।

তাকে মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলামাবাদে শলা–পরামর্শ চলছিল। আমি সে ধরনের একটা নির্দেশের জন্য অপেক্ষাও করছিলাম, ইতিমধ্যে আবার শুনতে পেলাম আইউব খান শেখ মুজিবকে মুক্ত করার বদলে মার্শাল ল' জারির ফিকিরে আছেন। একদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এডমিরাল এ, আর, খান এবং মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর – জেনারেল ঢাকা এলেন এবং রাতের বেলায় জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন–এর সাথে দেখা করেন। আমিও তখন সেখানে ছিলাম । সম্ভবতঃ সেটা ছিল ২২ ফেব্রুয়ারী। তারা বলছিলেন, মার্শাল ল' শুধু পূর্ব পাকিস্তানে জারি করা হোক। আমি এর বিরোধিতা করে বললাম, মার্শাল ল' জারি করতে হলে দেশের উভয় অংশেই করতে হবে। শুধু দেশের পূর্বাঞ্চলে মার্শাল 'ল জারি করলে মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। দ্বিতীয়তঃ মার্শাল 'ল দিয়ে আইউব খানকে সরে যেতে হবে। কারণ, পরিস্থিতি এমন এক বিপজ্জনক বাঁকে এসে উপনীত হয়েছে যে, আইউব খানের অনুকূলে তা জারি করা সম্ভব হবে না। আমাদের মতে অন্য কেউ মার্শাল ল' জারি করলে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে আসবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ–আলোচনার পর তারা দু'জন চলে গেলেন এবং যেয়ে রিপোর্ট দিলেন যে, শুধু পূর্ব পাকিস্তানে মার্শাল ল' জারি করা সম্ভব হবে না। ক'দিন পর শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ এলো। শেখ মুজিবকে যখন এই সুসংবাদ দেয়া হলো, তিনি আরো এক পা এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, রাওয়ালপিন্ডি যাবার আগে আমাকে একটা সভা করতে দিন, যাতে জনতার কাছ থেকে একটা অনুমোদন নিয়ে বৈঠকে সুষ্ঠুভাবে ভূমিকা পালন করতে পারি। শেখ মুজিবের এ কথাও পরদিন পাঠিয়ে দেয়া হলো।

এটা আমাদের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, সামরিক বাহিনীর লোকেরা সরল অন্তঃকরনের হয়ে থাকে। রাজনৈতিক নেতাদের চালের মারপ্যাচ বোঝাবার ক্ষমতা তাদের নেই। শেখ মুজিব আসলে নিজের শক্তির ওজন যাচাই করতে চেয়েছিলেন। সভা করার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া

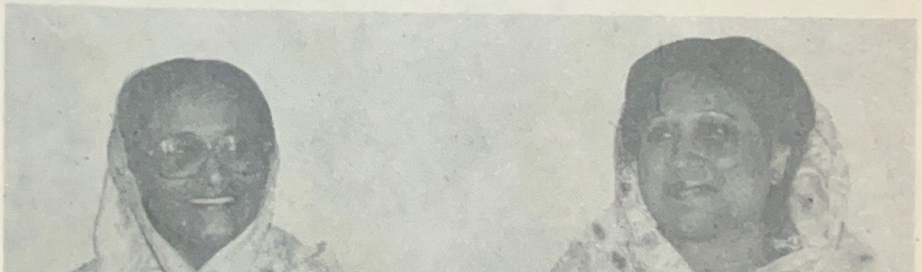

দুটি নির্মম হত্যার মূর্তমান প্রতিবাদ হিসাবে এগিয়ে এসেছেন দুটি নারী হৃদয়, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া। ক্রমশঃ তাদের জোড়ালো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ, প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ। আজ এরা দুজনই দেদীপ্যমান দুই নেত্রী, কণ্ঠে গনতন্ত্রের নামাবলী, চারদিকে হতাশা আর অবিশ্বাস, শুধু জিজ্ঞাসা, এই বাংলায় নিরেট গনতন্ত্রের জন্য আর কত রক্ত দিতে হবে?

২৫শে মার্চের সেই কালোরাত্রি ছিল বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা ও অসমঝোতার একটি চরম বহিঃ প্রকাশ। সমঝোতার নাম করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এসেছিলেন ঢাকায়। বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নবাণের সামনে তিনি বলে উঠলেন, "মেরে দেমাগ মে তো কুছ নেহি আতা"।
নিরীহ বাঙ্গালীদের ওপর ২৫শে মার্চ সৈন্য বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদ ফিরে যান।তার প্রতি গন আক্রোশ প্রকাশ করে শিল্পী কামরুল হাসান স্কেচটি আঁকেন। এ স্কেচটি যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের অনেকেই ইয়াহিয়া খানের আসল ছবি দেখেননি। হালে ২৬শে জানুয়ারী একটি পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তার অন্য ৩ জন সহযোগীর এই মর্মে কোর্ট মার্শাল হয়েছে যে, তারা অবৈধভাবে আইউবের নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন

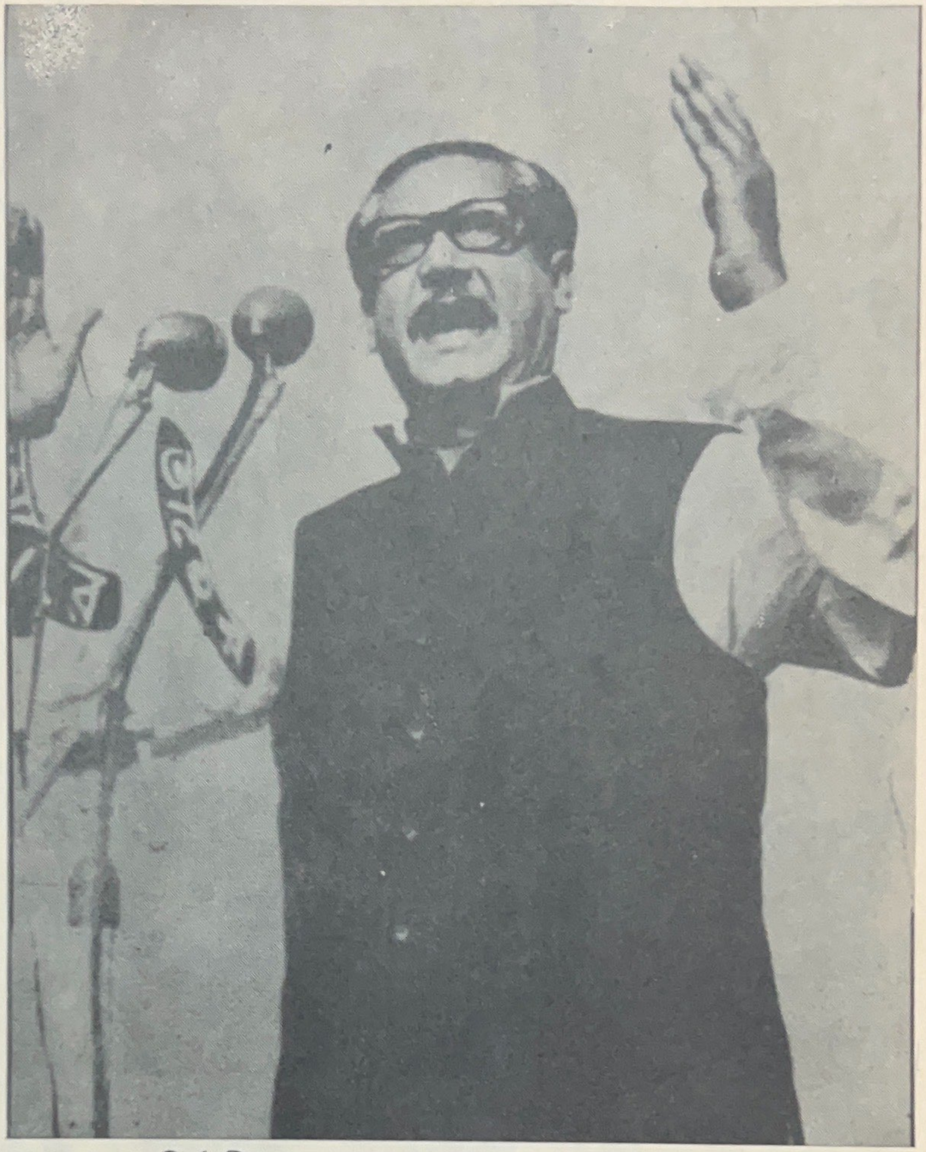

সত্তর সালের নির্বাচনী প্রচারকালে এক জনসভায় ভাষন দানরত শেখ মুজিব

শেখ রাসেল। শেখ মুজিবের সপরিবারে নিহত হওয়ার সময় বংশের শেষ সন্তান এই কোমল মতি শিশুটিও বাদ পড়েনি। পরবর্তীতে স্তআমি রাসেল বলছিস্ত নামকএকটি বহুল পঠিত বইতে তার সম্পর্কে একটি করুন আখ্যান বিবৃত হয়েছে

উপমহাদেশের মহান নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সান্নিধ্যে শেখ মুজিব। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব তাঁর কাছে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের আবেদন জানালে তিনি তা পালন করেন

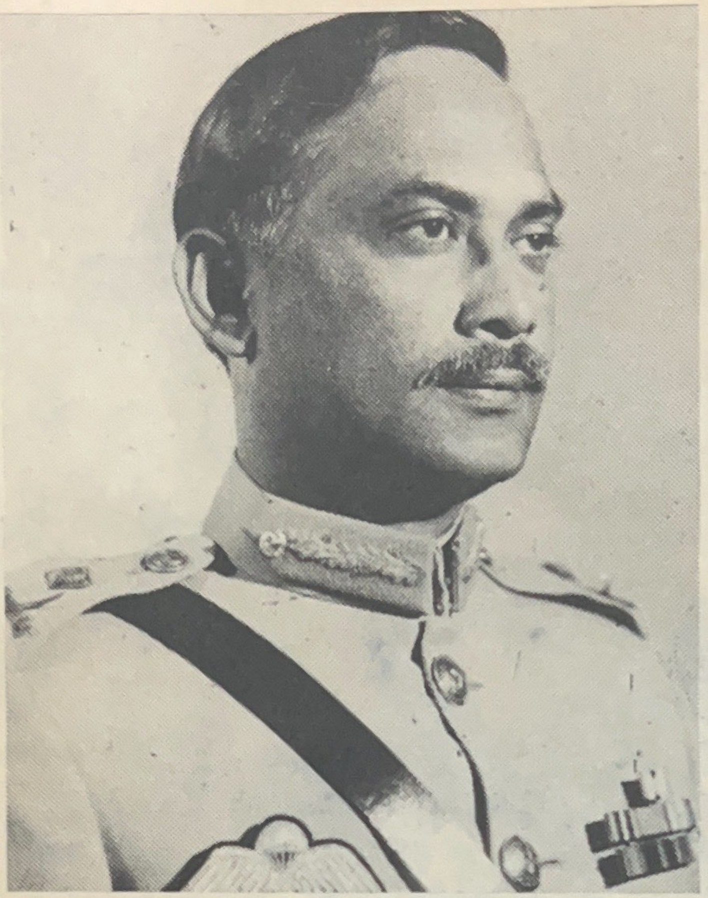

প্রেসিডেন্ট জিয়া ছিলেন আমাদের ইতিহাসে ধুমকেতুর মতো। তার আগমন এবং প্রস্থান গোটা জাতিকে হকচটিয়ে দিয়ে গেছে। মৃত জিয়ার অনুদঘটিত চরিত্র মাধুর্য্য সকলকে বিমোহিত করেছে। যেখানে ঘুষ, দূনীতি এবং পাপাচার মানুষকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে এমন সময়ে বঙ্গভবনের জৌলুষ মণ্ডিত পরিবেশে তিনি পড়তেন রিফু করা জামা, পুরনো জামা গুলো কেটে বাচ্চাদের জন্য তৈরী করতেন ছোট জামা, যার খাদ্য তালিকায় দুটোর বেশী আইটেম থাকতোনা এবং তিনি নামাজ পড়তেন অতি গোপনে। আজ চরিত্র হননের মহা–দূর্ভিক্ষের দিনে শহীদ জিয়ার বিশ্রুত এই আদর্শ হোক আমাদের চলার পাথেয়

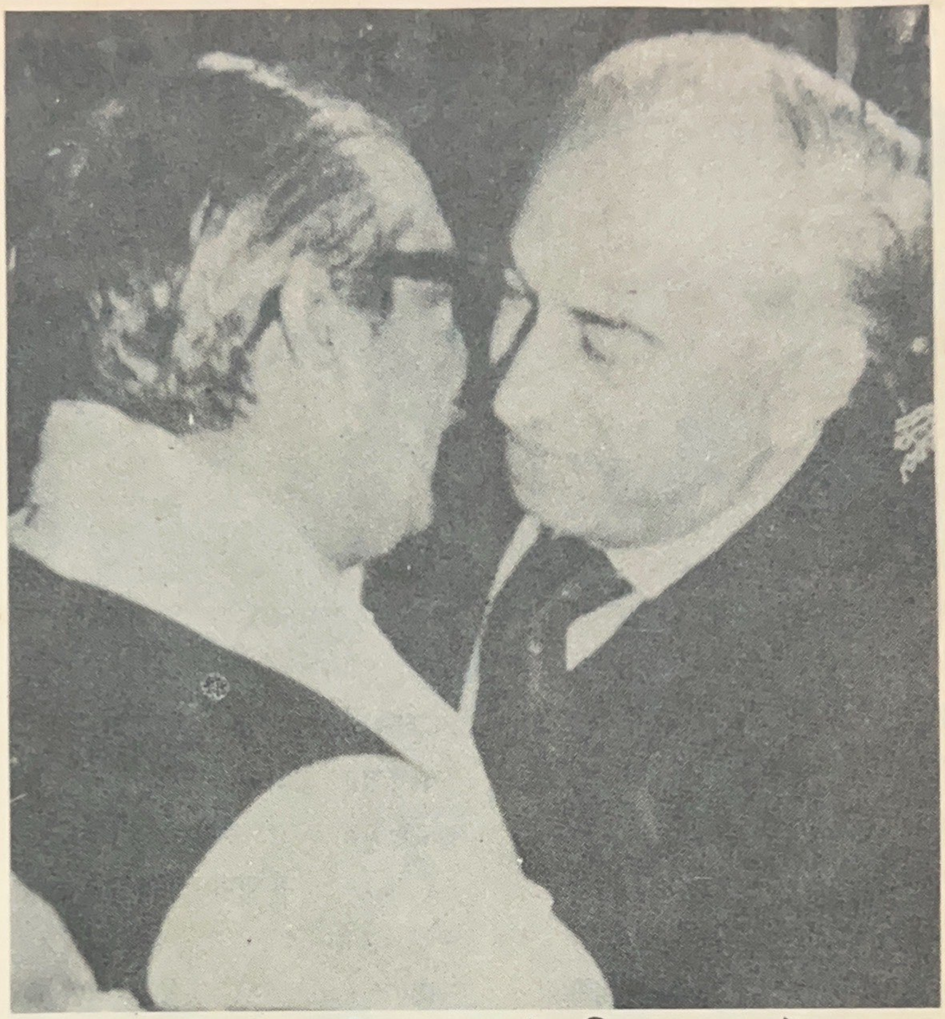

ঢাকায় ভূট্টো–মুজিব কোলাকুলি। এ সময় ভূট্টো মুজিবকে স্তবড় ভাইস্ত ও সংখ্যা গরিষ্ট নেতা বলে সম্বোধন করেন এবং নিজে প্রধান মন্ত্রী ও শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব তা নাকচ করে দেন।

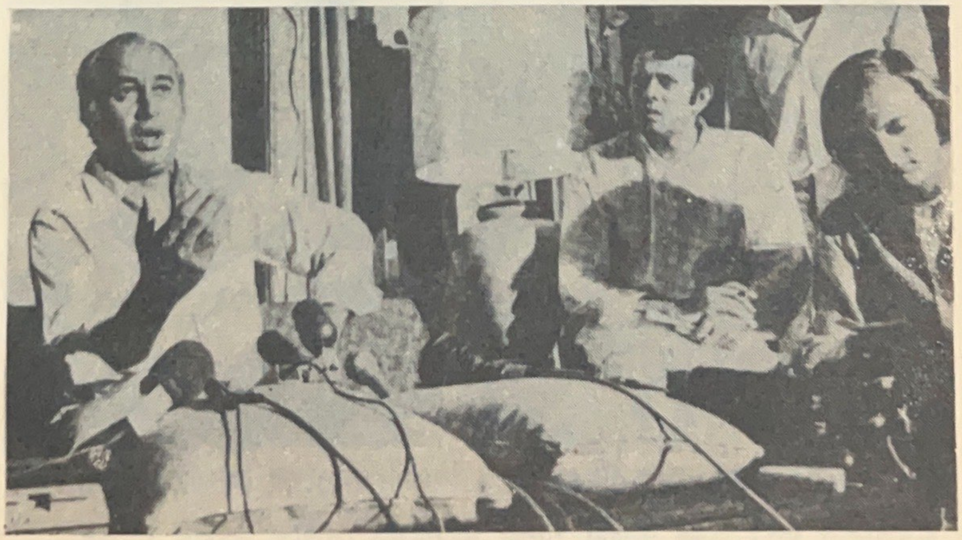

নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ যখন সংখ্যা গরিষ্টতা অর্জন করে ভূট্টো ঢাকাতে এসে হুশিয়ারী উচ্চারন করে বলেন, আমাকেও ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে

মেজর এম, এ মঞ্জুর, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি পর্য্যায়ক্রমে আট ও নয় নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন। কালক্রমে তিনিই প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার নেতৃত্ব দেন। জিয়া হত্যার পর তিনি খাগড়াছড়ির গভীর জংগলে স্ত্রী পুত্র সহ পলায়নরত অবস্থায় ধৃত এবং নৃশংসভাবে নিহত হন

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ছিলেন ঢাকাতে বেসামরিক সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা, তারই মুল বক্তব্যের উপর লিখিত এই বইতে তিনি আমাদের সংকটের জন্য প্রধানত দায়ী করেছেন ভূট্টোকে এবং সন্তোষজনকভাবে মুল্যায়ন করেছেন শেখ মুজিব তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে

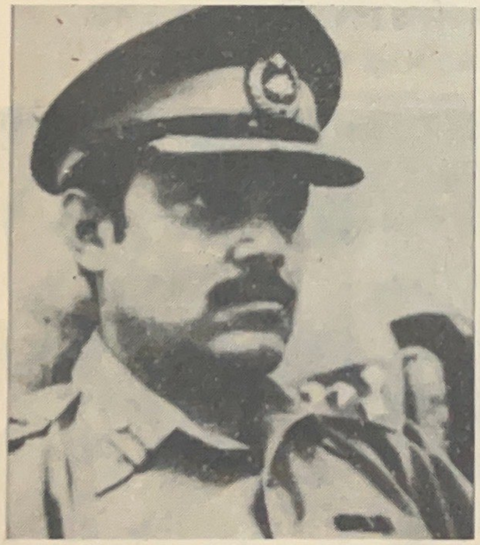

শেখমুজিবের হত্যার অব্যবহিত পরেই সিপাহী বিপ্লবের জোয়ারে জিয়া ক্ষমতাসীন হন। তখন একটি পাল্টা বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন খালেদ মোশাররফ। তিনি তাৎক্ষনিক ভাবে নিহত হন। চিত্রে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও তার স্ত্রী

এক রাষ্ট্রীয় সফরে সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে শেখমুজিব, সাথে রয়েছেন পুত্র রাসেল। অন্যান্য সফর সঙ্গী ছিলেন তোফায়েল আহমদ ও মহিউদ্দিন প্রমুখ

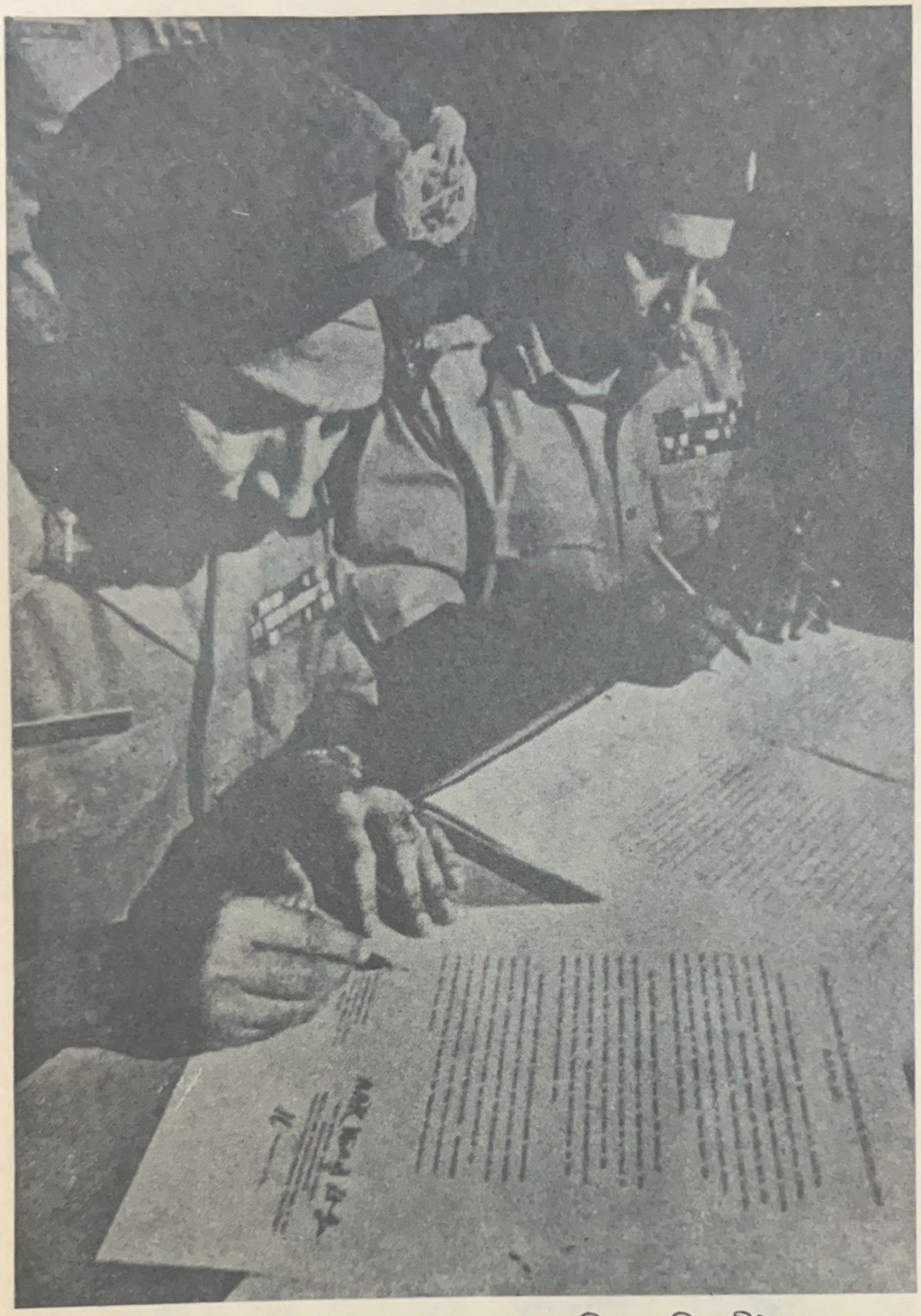

মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় যৌথ কমাণ্ডের কাছে পরাজিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের দলিল স্বাক্ষরদানের দৃশ্য। চিত্রে জেনারেল অরোরা এবং জেনারেল নিয়াজীকে দেখা যাচ্ছে। দুত্বজন জেনারেল ছোটবেলায় নাকি সহপাঠী ছিলেন

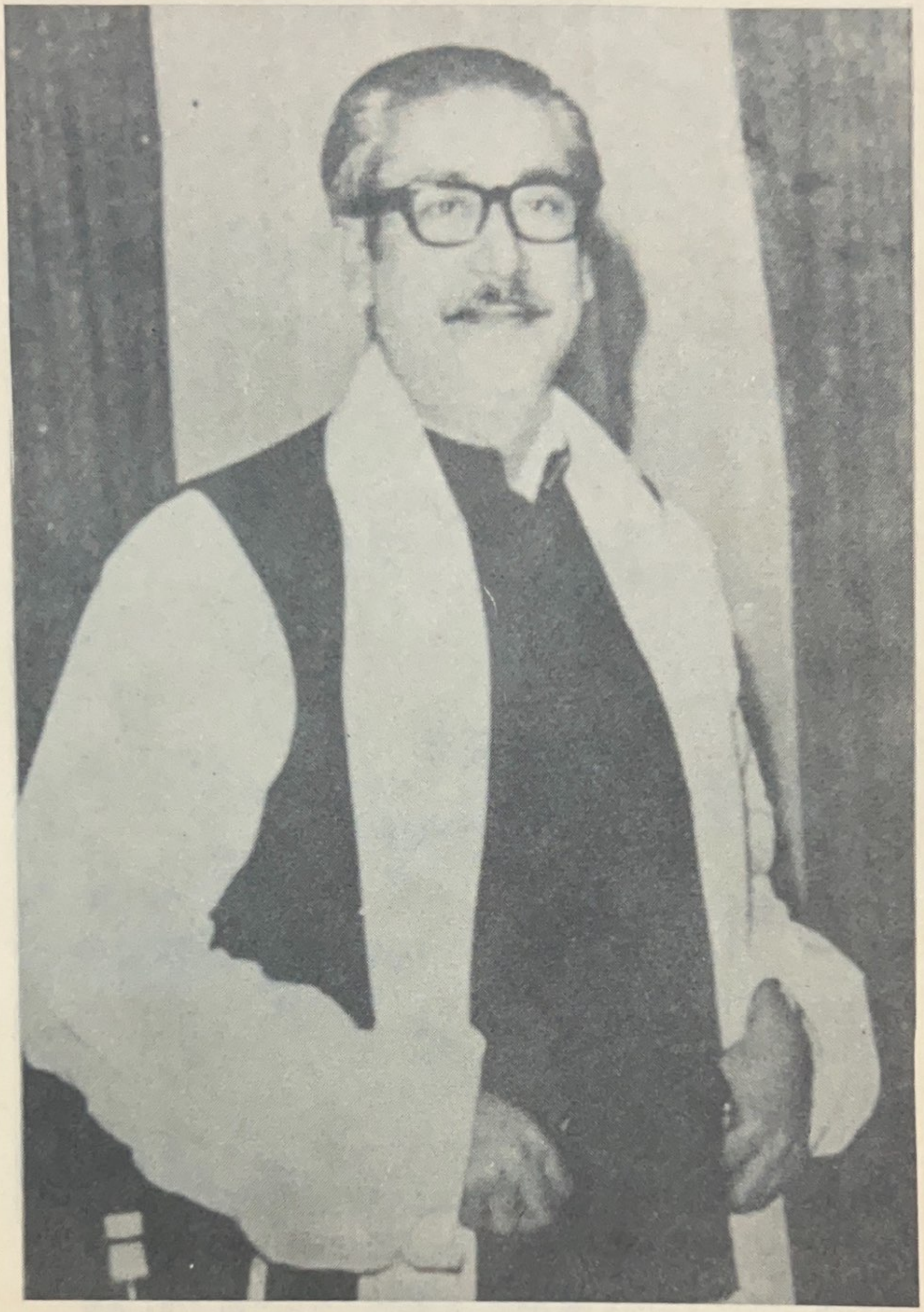

শেখ মুজিবের একটি স্থায়ী পোর্ট্রেট । মাটি ও মানুষকে ভালোবাসার একটি জলন্ত প্রতীক। ক্ষমতায় আরোহনের পর এই পোর্ট্রেট সকল সরকারী ও বেসরকারী অফিসে টানানো হতো

যুদ্ধ বিগ্রহ পুর্ণ সংগ্রামের দিন গুলোতে মুক্তিবাহিনীর দামাল ছেলেরা এধরনের সাবধানী পদচারনায় এগিয়ে যেতেন সকল প্রতিকুলতা উপেক্ষা করে। কিন্ত আজ তারা কোথায়? সকল সুবিধা ও বেঁচে থাকার উপকরণ থেকে বঞ্চিত বহু মুক্তি যোদ্ধা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছেন লোক চক্ষুর অন্তরালে

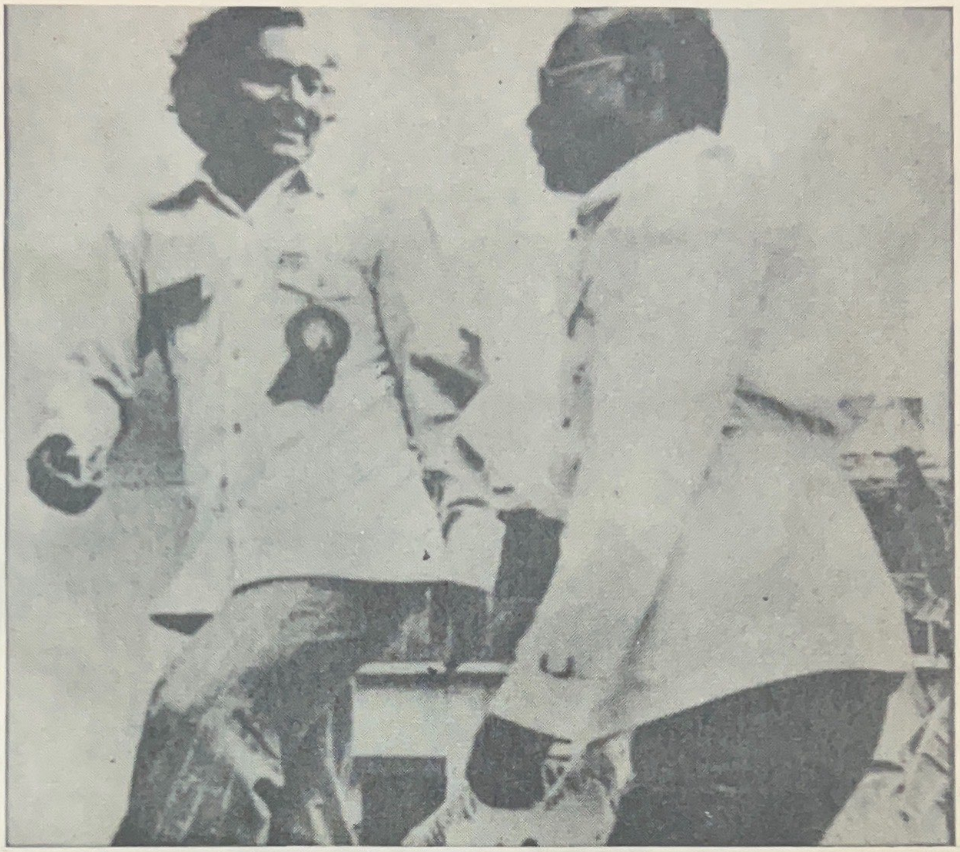

মরহুম জিয়ার খালকাটা কর্মসূচীর এক পর্যায়ে ভোলার প্রানপ্রিয় মোশাররফ হোসেন শাহজাহান এর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়া। এই প্রকল্পে ভোলাতে এক পয়সাও খরচ না করে একটি দীর্ঘ ৫ মাইল খাল খনন করা হয়েছিল

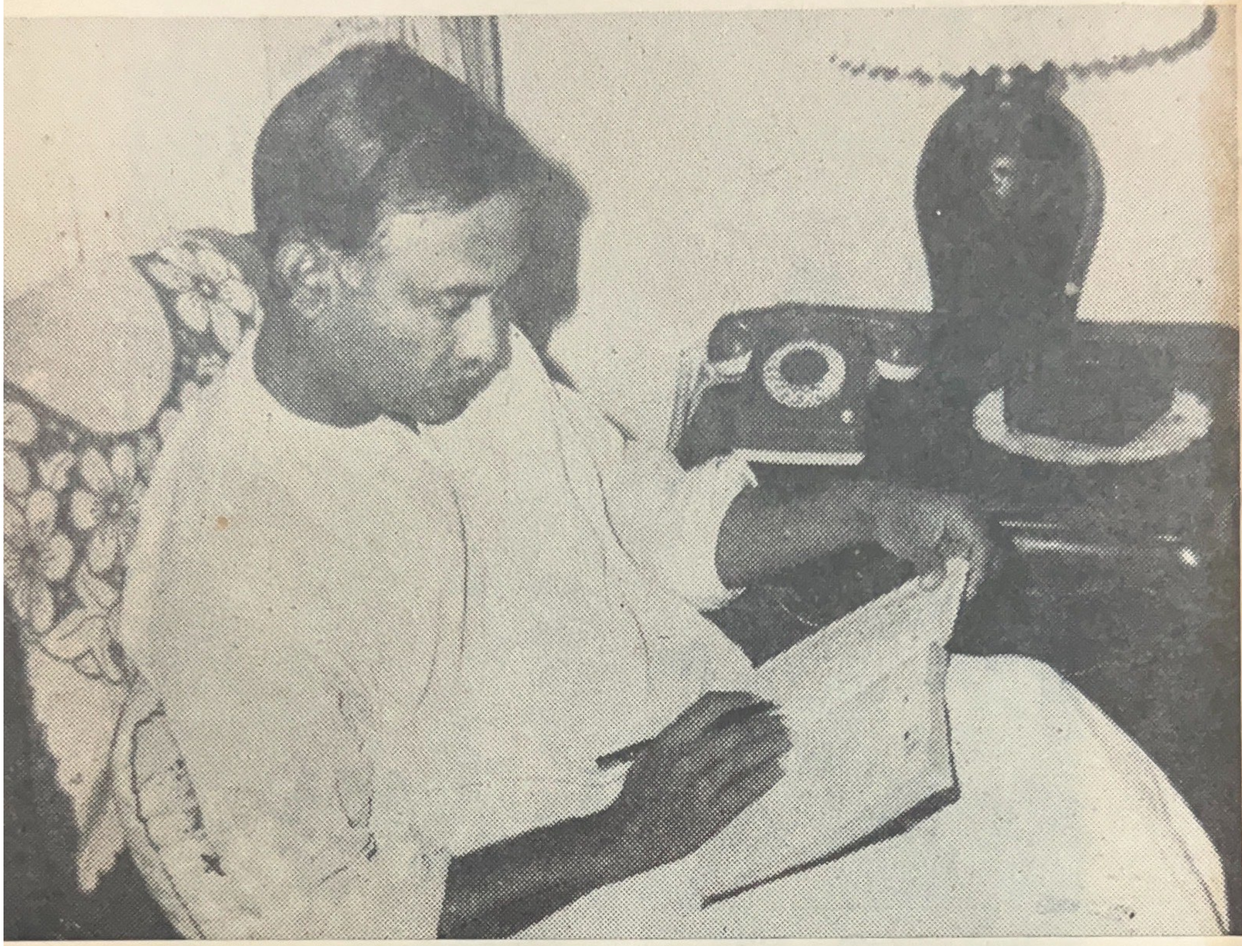

প্রেসিডেন্ট জিয়ার একটি ব্যক্তিগত ছবি। অবসর সময়ে এভাবে বসে তিনি ডাইরী লিখতেন

রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
বুদ্ধিজীবিদের লাশের চিত্র

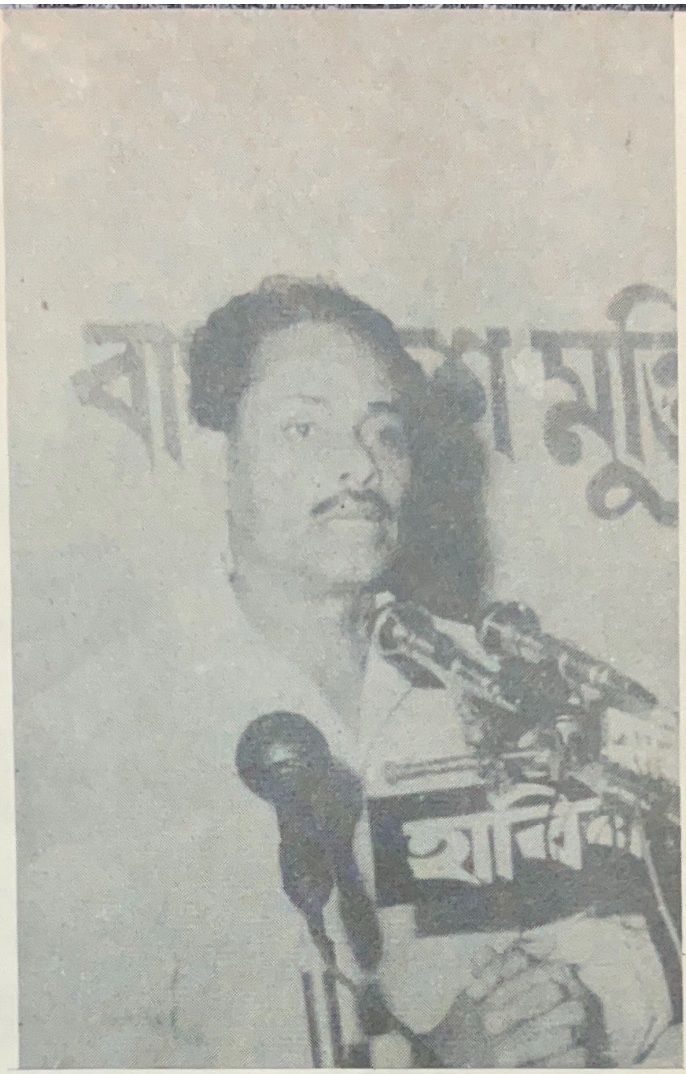

দীর্ঘ সাড়ে আট বছর ক্ষমতায় আসীন থাকার পর গন-আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত ৪র্থ সামরিক প্রেসিডেন্ট এরশাদ। তিনি আবার নির্বাচন করার অনুমতি লাভ করেছেন। বর্তমানে অন্তরীন রয়েছেন

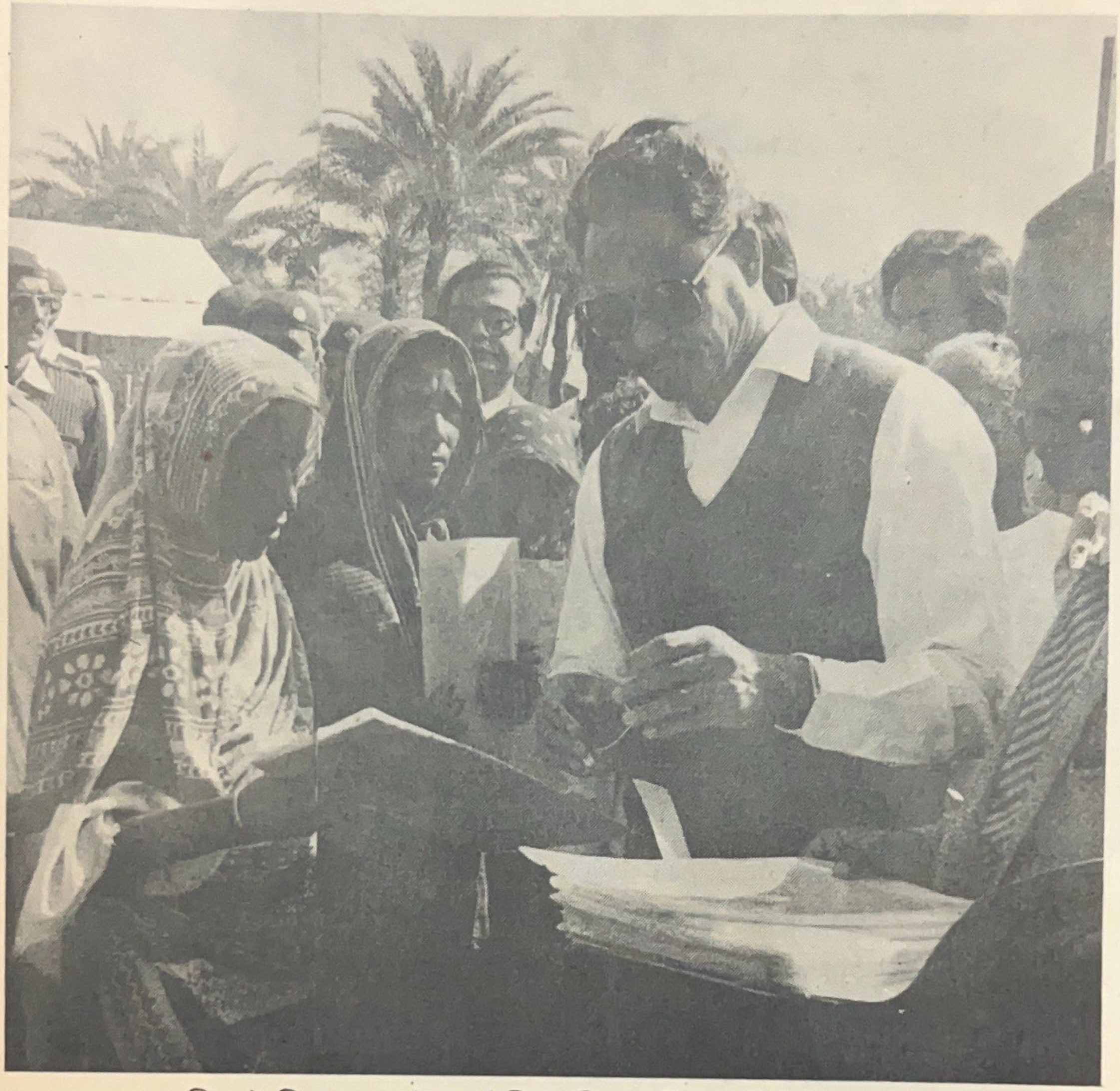

প্রেসিডেন্ট জিয়া খালকাটা কর্মসূচীর অধীনে গ্রামীন অর্থনীতি উন্নয়নের যে ডাক দিয়েছিলেন তারই পরিনতি লাভ হয়েছিল পরবর্তীতে উপজেলা কার্য্যক্রম, গুচ্ছগ্রাম, পথকলি ও অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে। এই সব কর্মসূচীর পথিকৃৎ ছিলেন এরশাদ। কিছু ব্যক্তিগত বিরূপ প্রচারনার পাশে তার এসব অবদান কোনদিন ম্লান হবার নয়। তাঁর সৌভাগ্য ছিল এই, তিনি সময় পেয়েছিলেন দীর্ঘদিন। এই দীর্ঘ সময়কে তিনি অর্থবহ করে তোলার জন্য নিরলস চেষ্টা করেছেন এবং হন্যে হয়ে ফিরেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে

হলো। সভায় ৬/৭ লক্ষ লোকের সমাগম হলো। এর পর বীরোচিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন এবং তার গোয়ার্তুমীর জন্য 'গোলটেবিল', বৈঠক' পন্ড হয়। ওদিকে মিঃ ভূট্টো প্রথম থেকেই 'গোলটেবিল বৈঠক' বয়কট করে রেখেছিলেন। এজন্যে এই মিটিং-এ রাজনৈতিক সমাধানের সকল পথ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর বাধ্যহয়ে রাজনৈতিক দলগুলো গোপন শলা-পরামর্শ শুরু করে দিল।

এদিকে আইউব খান শেষের দিকে একটা নিয়ম শুরু করেন যে, প্রেসিডেন্টের অনুমতি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানে আসতে পারবে না। ১১ই মার্চ জেনারেল মোজাফফর উদ্দিন রাওয়ালপিন্ডি যান। একই দিনে একজন সিনিয়র মন্ত্রী জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কোথায়? কারণ, প্রেসিডেন্টের একটা বিশেষ পয়গাম তাকে পৌঁছাতে হবে। আমরা বুঝতে পারলাম, মোজাফফরউদ্দিনের গমন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কিছুই জানেন না। তাকে প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ডেকে পাঠিয়েছিলেন। একটা জরুরী বৈঠকে বড় বড় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো ২৫ শে মার্চের মার্শাল ল'। এই গোপন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আইউব খান কিছুই জানতেন না।

এরপর এপ্রিল মাসে জেনারেল গুল হাসান যখন ঢাকা আসেন, এই বৈঠকের পুরো বিবরণ পাওয়া যায়। এ সময় 'আমি 'গভর্নর হাউসে' ছিলাম। গুল হাসান এ সময় চীফ্ অব্ জেনারেল স্টাফ ছিলেন। তিনি বললেন, মিটিং-এর সময় আমি জেনারেল ইয়াহিয়ার কামরায় প্রবেশ করে ঠিক সামনে বসে টেবিলে থাপ্পর মেরে বললাম, আমরা মার্শাল 'ল চাই; আর তা হবে আপনার নেতৃত্বে। জেনারেল ইয়াহিয়া বললেন, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আমি জবাবে বললাম, আমি উত্তেজিত হচ্ছি থোড়াই। আমি শুধু জানিয়ে দিতে চাই, দেশের সর্বময় ক্ষমতা আপনি নিয়ে নিন।

জেনারেল ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট আইউবকে বলে দিয়েছিলেন, আমরা পরিস্থিতির অবনতি আর দেখতে চাই না। ২৫ শে মার্চের আগে আপনার যা করণীয় করে ফেলুন। আইউব খান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বদল করেন। আমার বেশ মনে আছে, জানুয়ারীর শেষের দিকে ফিল্ড মার্শাল ঢাকা এলেন এবং প্রেসিডেন্ট হাউসে 'ডিনার' ছিল। আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, প্রেসিডেন্ট এখানকার বেসামাল অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি আমাদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না; বরং তিনি কিছু পরামর্শ দিলেন। 'ডিনার' শেষে জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন মোনেম খানের বরখাস্তের প্রস্তাব পেশ করেন, কিন্তু আইউব খান তা মানলেন না।

২২শে মার্চ গভর্নর এম, এন, হুদা শপথ গ্রহণ করলেন। ২৪ শে মার্চ আমি জেনারেল মোজাফফরউদ্দিনের সাথে রাওয়ালপিন্ডি গেলাম। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক হলো। মার্শাল 'ল'র প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো এবং শেষে সবাই মিলে 'প্রেসিডেন্ট হাউসে' গেলাম। সেখানে প্রেসিডেন্ট আইউব, আলতাফ গওহর এবং ফিদা হাসান আমাদের অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম আলোচনাতেই ফিল্ড মার্শাল বললেন, এখন দেখছি, মার্শাল ল' ছাড়া কোন

উপায় নেই। ইয়াহিয়া খান বললেন, 'আলবত'। প্রেসিডেন্ট আইউব ভেবেছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে মার্শাল ল' জারি হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'মার্শাল ল' সামরিক বাহিনীর লোকদের নেতৃত্বে হবে।' একথা শুনে আইউব খান বললেন, 'আপনাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, আমি পদত্যাগ করছি'। এরপর প্রশ্ন হলো, কার বক্তৃতা প্রথমে রেকর্ড করা হবে। ইয়াহিয়া খান বললেন, প্রথমে আইউব খানের বক্তৃতা রেকর্ড করা হোক। কিন্তু অন্যদের ইচ্ছে ছিল, ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা আগে রেকর্ড হোক। ইয়াহিয়া খান পরে এটাকে একটা ঝুঁকি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। প্রেসিডেন্ট এটাকে অপরাধ গণ্য করে আমাকে বিদ্রোহের অভিযোগ করতে পারতেন। আমার বেশ মনে আছে, সেদিনেই আইউব খানের বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়। আলতাফ গওহর-এর ইচ্ছে ছিল, রেডিওর 'কন্ট্রোল' তার হাতে থাকবে। কিন্তু জেনারেল ওমর আগে থেকেই সব বন্দোবস্ত সেরে রেখে ছিলেন। খুবই সতর্কতার সাথে জেনারেল শওকত রেজা এই বক্তৃতা করাচীতে নিয়ে গিয়ে জেনারেল রিয়াজের কাছে রাখেন। তার উপস্থিতিতেই এই বক্তৃতা প্রচার করা হয় এবং ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা পরদিন প্রচার করা হয়। ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতার নেপথ্যে আরো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির কন্ঠ ছিল। পিলু মোদীর 'জুলফী মাই ফ্রেন্ড' বইতে ভূট্টো- ইয়াহিয়া সাক্ষাৎকার-এর বর্ণনা আছে। এটা সংঘটিত হয়েছিল ২৪শে মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে। তিনি লিখেছেন, ২৪শে মার্চ ভূট্টো তার আন্টির জানাজার জন্য করাচী থেকে বিমানযোগে লারকানা রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে রহস্যজনক ভাবে এই বিমানের গতি রাওয়ালপিণ্ডির দিকে ফেরানো হয়। অজুহাত ছিল, আবহাওয়ার গোলমাল। ভূট্টো পিণ্ডিতে পৌছার পর ইয়াহিয়া খানের পয়গাম পেলেন। ইয়াহিয়া খান চরম অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন এবং অনাগত পরিস্থিতির জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বললেন, আইউব খান ব্যর্থ হয়েছেন, আমি ক্ষমতা গ্রহন করছি, এখন তোমার কি মতামত? ভূট্টো ৩টি শর্তে রাজী হলেন এবং ইয়াহিয়া খান স্বস্তির নিঃন১২াস নিলেন। এই রহস্যজনক সাক্ষাৎকার পরবর্তী কালে আরো অনেক রহস্যজনক ঘটনাবলী নেপথ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মার্শাল ল জারি হওয়ার পর দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরে এলো। বন্যাপীড়িত পূর্ব পাকিস্তানকে একেবারে শান্ত মনে হলো। রাজনৈতিক কর্মীদের আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। নেতারা আত্মগোপন করেছেন। শ্রমিক আন্দোলন থেমে গেছে।

মার্শাল ল' জারির দ্বিতীয় দিনে জেনারেল ইয়াহিয়া রেডিওতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের প্রতি খুব জোর দিয়েছিলেন। এই ঘোষণার সাথে আইউব খানের ঘোষণার মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে সারাদেশের পরিস্থিতি দিন দিন পাল্টে যাচ্ছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া আইউবের ভংগিতে কথা বলতে পারছিলেন না।

অশান্ত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। কিন্তু এরই মধ্যে একটি ঘটনা সর্বত্র দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এয়ার মার্শাল নূর খান তখন ডেপুটি মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ছাড়াও শিক্ষা এবং শ্রম বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিভিন্ন সমস্যাবলী

নিরসনকল্পে তিনি গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন করছিলেন। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ তিনি একদিন পূর্ব পাকিস্তানে এসে হাজির হলেন। এয়ার ফোর্সের ইন্‌চার্জ জুলফিকারই শুধু খবরটা জানতো। সে-ই আমাদের পরে ঘটনাটি জানায়। তার আগমন সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনও কিছু জানতো না। তিনি এখানে ছাত্র এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষৎদান করেন। এ- ব্যাপারে আমাদের কোন পরামর্শ গ্রহন করা হয়নি। ছাত্র- প্রতিনিধিদের সাথে তিনি ছ'দফা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিয়েও আলাপ হয়। তিনি এ- ব্যাপারে ঘোষণা করলেন, পূর্বে ঘেরাওর মাধ্যমে শ্রমিকেরা যে দাবী-দাওয়া অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে শিল্পপতিদের তা পূরণ করতে হবে।

'৬৯-এর প্রথমদিকে আইউব খানের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির দারুণ অবনতি হয়েছিল। এই সুযোগে মওলানা ভাসানী ঘেরাও-জ্বালাও ধ্বনি শুরু করেন। ফলে, শ্রমিকেরা মিল কারখানায় আজগুবি দাবী – দাওয়া তুলে মালিকদের তা মানতে বাধ্য করতে লাগল। জবরদস্তি কোন একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়া সম্পূর্ন আইনবিরোধী ছিল। কিন্তু নূর খানের এই ঘোষণায় শ্রমিকদের জন্য তা যেন বৈধ হয়ে গেল।

নূর খানের এই সফরে ছাত্রদের 'মুড'ও বদলে গেল। মার্শাল ল'-র ভয়ে ছাত্ররা গুটিসুটি মেরে বসেছিল, তারা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কি করে তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করা যায়। এমতাবস্থায় নূর খানের মতো লোক যখন তাদের ডেকে পাঠাল এবং ছ'দফা সম্পর্কে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা করল, তখন তাদের মনে কোন আশংকা থাকলো না। তাদের মনে হলো, আসলে সরকার ছ'দফার বিরুদ্ধে নয়।

এই সময় দেশে সাংবিধানিক বিতর্ক উত্থাপিত হলো এবং '৫৬ সালের বিধান অনুযায়ী সত্বর নির্বাচন করার দাবী উঠল। এর পেছনে যুক্তি দেখানো হলো, আইউব খান '৫৬ সালে বেআইনীভাবে সংবিধান বাতিল করে দেন। এই সংবিধান পুনর্বহাল করলে লাভ এই হবে, জাতি নতুন সংবিধান তৈরীর ঝকমারী থেকে রেহাই পাবে এবং নির্বাচনও সত্বর হবে। আমার বেশ মনে আছে, দৈনিক ইত্তেফাকের মানিক মিয়া এই প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন এবং এ-ব্যাপারে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের সাথেও আলাপ-আলোচনা চলছিল। ক্রমান্বয়ে প্রস্তাবটি জোরদার হচ্ছিল। শেখ মুজিবও এ - ব্যাপারে অসম্মত ছিলেন না; কারণ, তার উপর মানিক মিঞার বিরাট প্রভাব ছিল।

শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল '৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। শেখ সাহেবকে জেল থেকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মাঝে তাকে কিভাবে জেল থেকে বের করা হবে? জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন আমার সাথে পরামর্শ করলেন। আমি বললাম, এ দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করুন চারদিকে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। কারণ, ক'দিন আগেই আগরতলা কেসের আসামী শেখ সাহেবের সহযোগী সার্জেন্ট জহুরুল হক সেনাবাহিনীর কাছে আটক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা সারাদেশে ভূকম্পনের সৃষ্টি করে। আমাকে এ দায়িত্ব দেয়ার পর আমি ঝটপট জেলখানায় পৌছলাম এবং শেখ মুজিব ও

তার সাথীদের নিয়ে গাড়ীতে ধানমন্ডি রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে শেখ সাহেব প্রাণখুলে নানা কথা বলছিলেন। ৩ বছর পর তিনি বাইরে এসেছেন, চোখ বিস্ফারিত করে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। বলছিলেন, বাহ্! এ গাছটি দেখছি বেশ বড় হয়ে গেছে, বেশ সুন্দর সুন্দর দালানকোঠা উঠেছে; এখন আর এলাকাগুলোকে চেনাই যায় না। কথায় কথায় আমিও বললাম, শেখ সাহেব! দেশের অবস্থা খুবই সংগীন, চারদিকে আগুন জ্বলছে। আপনার উপরে এ–ব্যাপারে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। জবাবে শেখ সাহেব বললেন, কোন চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ইসলামাবাদ যাব, প্রেসিডেন্ট আইউবের হাতকে আমি শক্তিশালী করব।

শুনে আমার মনে হলো–আমি হেরে গেছি, তিনি জিতে গেছেন। শেখ সাহেবের বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল। দরজা খুলতেই সে এক প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হলো। বাড়ীর লোকজনেরা তার মুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। এজন্য বিবাহ–উৎসবের মতো আনন্দে নেচে উঠলো সবাই। আমাকে বলা হয়েছিল, তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই যেন আমি চলে আসি। কিন্তু এভাবে চোরের মতো চলে আসতে আমার মন চাইল না। এ জন্যে আমি আর ফিরে আসার তাড়া করলাম না। শেখ সাহেব আমাকে ভেতরে নিয়ে বসালেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এভাবে সকলের সাথে মোটামুটি একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল আমার।

এরপর থেকে শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আমার বন্ধুত্ব বড় পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। কোন পার্টিতে বা মজলিশে দেখা হলেই দৌড়ে এসে মিলিত হতেন এবং কুশল বিনিময় করতেন। মার্শাল ল'র আমলেও আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে কোন অবনতি ঘটেনি। মার্শাল ল' ৫ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখানে প্রশাসনিক রদবদল হয় এবং ভাইস এডমিরাল আহসান গভর্নর নিযুক্ত হন। নিয়োজিত হওয়ার পর তিনি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে এক রিপোর্ট পেশ করে জানান, তাড়াতাড়ি নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। জনসাধারণ মার্শাল ল'কে মানসিকভাবে গ্রহণ করেনি। দিন যতই যাবে, সমস্যাবলী বাড়বে; তখন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা দুস্কর হয়ে পড়বে।

এর জবাবে বলা হলো, ভোটার লিস্ট ও অন্যান্য প্রস্তুতি নেয়া হোক, এতে আট–দশ মাস লেগে যাবে, এর আগে নির্বাচন হতে পারে না।

আমার মতে এই জবাবের পেছনে একটি রাজনৈতিক চাল ছিল। এটা তো প্রথমেই বলা হয়েছিল, মার্শাল ল' জারির সময় ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর কাছ থেকে আস্থা গ্রহন করেছিলেন। ভূট্টো নির্বাচনের জন্য ১ বছরের সময় চেয়েছিলেন, যাতে করে তার দলকে সংগঠিত করা যায়।

জ্ঞাতসারে হোক বা অবচেতন মনেই হোক, ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর শলাপরামর্শের সাথে একমত হয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি '৫৬ সালের সংবিধান আলোচনা এক বিতর্কমূলক পর্যায়ে নিয়ে আসেন। প্রথম দিকে এ–সম্পর্কে জনগণের নমনীয় মনোভাব ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই '৫৬ সালের সংবিধান বহাল হতো এবং শেখ মুজিব তা মেনে নিতেন। কিন্তু প্রায় নিশ্চিত বিষয়টিকে দুর্বল করার জন্য চারদিক থেকে তৎপরতা শুরু হলো। এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের বিবৃতি প্রদান শুরু

হলো। সর্বপ্রথম মওলানা ভাসানী এবং ভূট্টো বিবৃতি দিলেন এবং তা জনসংযোগের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বভাবতঃই জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করতে লাগলো। ফলে, ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন, '৫৬ সালের সংবিধানের পুণর্বহাল হতে পারে না। এর সাথে বলা হলো, এ-ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে 'আলাপ-আলোচনা হবে।এই আলাপ-আলোচনার কথা বলায় আরো নতুন সমস্যার জন্ম হলো, যা পরবর্তীকালে এক অমীমাংসিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হলো।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র আমরা তখনও জানতাম, এখনও জানি। বেশীর ভাগ নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রনায়কের সাথে ব্যক্তিগতভাবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন এবং আশ্বাস দিতেন আমরা সব ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা করব। দেশ আপনিই চালাবেন, আমরা বাইরে সভা-সমিতি করব এবং আপনার বিরুদ্ধে অল্প-বিস্তর বক্তব্য রাখব, কিন্তু তা নিয়ে আপনি বিচলিত হবেন না। কারণ, জনগণকে সন্তুষ্ট রাখাও আমাদের কাজ। আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করব।

এ-ধরনের এক আলোচনায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলছিলেন, আমি হলাম গিয়ে আন্দোলনকারী, আন্দোলনই আমার জীবন। ক্ষমতা আমি চাইনা। ক্ষমতা গ্রহণ আমার দ্বারা হবেও না।

বেশীর ভাগ রাজনৈতিক কর্মী এ-ধরনের কথাবার্তা বলেন, কিন্তু বাইরে এসে তাদের সুর পাল্টে যায় এবং স্ববিরোধী বক্তব্য রাখেন। এসব করেই তারা চিরকাল সেনাবাহিনীর লোকদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসেন, যেখান থেকে তাদের আর ফিরে আসা সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, যখন পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ হলো, তারা '৫৬ সালের সংবিধানের ব্যাপারে নিজেদের মর্জি মাফিক একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করল, যার ফলে ইয়াহিয়া খানকে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এর নীতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলো। স্বাভাবতঃই এক পা ফেললে দ্বিতীয় পাও এগিয়ে আসে।

সেনাবাহিনী প্রধান ও রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে মেলামেশার দরুন আরো একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাহলো, যখন সামরিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের শৃঙ্খলা ও মানসিক শক্তিকে নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করে, তখন তাদের মনে হয় – এদের চাইতে তাদের (সামরিক) মাঝেই যোগ্যতা এবং শক্তি বেশি পরিমাণে রয়েছে। ক্রমেই তখন তাদের মনে হয়, রাষ্ট্র চালানোর ব্যাপারটা তাদের হাতেই থাকা উচিত? তাছাড়া দলভেদে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা অনেকটা স্থূল ও সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। অবশ্য চীফ এডমিনিস্ট্রেটরদের ব্যাপারটা তখন অন্যরকম দাঁড়ায়। তখন খামখেয়ালীটাই মূখ্য মনে হয়। এ-ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা তাকে ক্রমশঃ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভাবতে শুরু করেন আমি এদের সবার চাইতে বেশী বুঝি এবং একমাত্র আমিই সুশৃংখলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারি। এরপর যখন দেখা যায়, তাঁর প্রতিটি কথাই আইন, তখন তিনি আরো ফুলে ফেঁপে ওঠেন এবং একদিন সরাসরি ক্ষমতা ত্যাগে

অস্বীকৃতি জানান।

জেনারেল ইয়াহিয়ার মনেও হয়ত এ–ধরনের চিন্তা বাসা বেঁধেছিল অথবা তিনি সততার সাথে গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখাগেল, জন প্রতিনিধিদের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অপারগ হলেন। আমি ইতিহাসে এমন কোন ঘটনার কথা শুনিনি, যেখানে সামরিক জান্তা গন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। এক্ষেত্রে সামরিক সরকার শেষাবধি নিজেই বেসামরিক সরকারে রূপান্তরিত হয় এবং এটাই টিকে থাকার মোটামুটি সহজ পদ্ধতি।

উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশে জেনারেল জিয়াউর রহমান রেফারেণ্ডাম করিয়ে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হাফেজ আল–আসাদ, প্রেসিডেন্ট নোমাইরী ও প্রেসিডেন্ট নাসেরও একই পথ অনুসরন করেছিলেন।

আমরা '৭০ সালে কি দেখেছি? এটাই দেখলাম, বক্তৃতার জোরে মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে বিষোদগার করে নিজেদের শক্তি দিন দিন বাড়িয়ে তোলা হলো। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের ব্যাপারটাই পর্যালোচনা করুন। মার্শাল ল' প্রথমদিকে তার কথা মেনে নিলো। ফলে, তিনি বেশ অনুপ্রানিত হলেন। তা না করে যদি ছ'দফার ওপর বিধি–নিষেধ আরোপ করা হতো, তাহলে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হয়ে যেতো। ইয়াহিয়া খান তা না করে ভি ন্ন পথ অবলম্বন করলেন এবং শেখ মুজিবকে এগিয়ে যেতে দিলেন। এই নমনীয় নীতির দরুন তিনি আরো শক্ত হলেন এবং ঘোষনা করলেন, এই নির্বাচন মূলতঃ ছ'দফারই রেফারেণ্ডাম। এই মন্তব্য নিয়ে দারুন হৈ চৈ হলো। কিন্তু সামরিক সরকার এ– ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে পারলেন না। ইয়াহিয়া খান ইসলামী ভাবাবেগ ও দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এল,এফ,ও তৈরী করলেন। এই আইন–কাঠামোর মধ্যে ছ'দফার অন্তর্ভূক্তির কোন অবকাশ ছিল না। সবরকম আইন অনুমোদন প্রেসিডেন্ট নিজের হাতে রাখলেন। শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে বললেন, আমি এল,এফ ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেব। এই পরিস্থিতি সামলাবার জন্য ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে এলেন এবং শেখ সাহেবের ব্যাপক জনসমর্থনের সামনে মাথানত করে সাংবাদিকদের বললেন, বিধান বা আইনের অনুমোদন সংক্রান্ত ব্যাপারটি সম্পূর্ন আপেক্ষিক।

সময়ের গতির সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অবশিষ্ট সকল রাজনৈতিক দল ঝিমিয়ে পড়ল এবং শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের হুংকারে পূর্ব পাকিস্তান গম গম করে উঠল। সামরিক সরকারের সাথে সংঘাত সৃষ্টিই ছিল শেখ মুজিবের দলের মূখ্য নীতি। শেখ মুজিবের বাগ্মিতা জনসাধারনকে তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল এবং নির্বাচনের সময় জনগণ তাকে নেতা হিসেবে উপস্থাপিত করে। নির্বাচনের পর শেখ সাহেব তার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে শপথ নিলেন যে, তারা ছ'দফার পূর্ন বাস্তবায়ন করবেন। ওদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে বললেন, এ সব কথায় আপনারা বিচলিত হবেন না। জনসাধারণকে খুশি করার জন্য এ – ধরনের মুখরোচক কিছু কথা আমাদের বলতে হয়। কিন্তু শেষাবধি পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সেনাবাহিনীকে কঠোর

শক্তি প্রয়োগ করতে হয় এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল পরিকল্পনা তাসের ঘরের মতো ভেংগে চুরে যায়।

শেখ মুজিবের সাথে প্রেসিডেন্টের যত রকম রাজনৈতিক আলোচনা হতো, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে ডাকা হতো না। ইয়াহিয়া খান নিজেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী ঢাকা আসতেন, কিন্তু আমাদের সাথে কোন শলা-পরামর্শ করতেন না। আমরা প্রথম দিকে জানতেই পারতাম না, নেতাদের সাথে প্রেসিডেন্টের কি সব আলোচনা চলছে। আমরা বার কয়েক পরামর্শ দিয়েছিলাম 'অমুক অমুক' ব্যক্তিদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা যেতে পারে, এরা আমাদের নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আমাদের কথার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করা হয়নি।

আওয়ামী লীগের পাশাপাশি আমি ইসলামপন্থীদের যে দলটি কল্পনা করতাম, তাদের অস্তিত্ব সত্যি নড়বড়ে ছিল। এদের জন সমর্থন তেমন ছিল না। এককালে মুলিম লীগের মতো শক্তি-শালী দল ছিল না। কিন্তু মুসলিম লীগ হালে ত্রিধাবিভক্ত। মুসলিম লীগের বেশ ক'জন 'লিডার' ছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের সাথে তাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছে। পি.ডি.পি.র একমাত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন নুরুল আমিন সাহেব। এছাড়া বাদবাকী ইসলামী দলগুলোর চৌহদি ছিল ড্রইংরুমে। এর মধ্যে জামাতে ইসলামীই একমাত্র দল ছিল, যারা পুরোপুরি সুসংগঠিত। কিন্তু তাদের পরিধি ছিল শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই দল বক্তৃতার চাইতে কলমের মাধ্যমে জ্ঞান ও মতবাদ ছড়াবার চেষ্টা করতো। নেজামে ইসলাম পি.ডি.পি.রই একটি অংগদল ছিল। এদের পরিধি ছিল ধর্মীয় মাদ্রাসাসমূহে। এমতাবস্থায় আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, আওয়ামী লীগ দানব প্রকৃতির দেহ ধারন করে একে একে সব কিছু গলধঃকরণ করে চলেছে। ক্রমশঃ এটাও সুস্পষ্ট হতে লাগল যে, আওয়ামী লীগের একটা দল সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিল। আসলে প্রকৃত অর্থে আওয়ামী লীগ কোন রাজনৈতিক দল ছিল বলে আমি মনে করি না। এদের দলে সব রকম লোকের সমাবেশ ছিল। উদাহরন স্বরূপ, তাজুদ্দিনের লোকেরা কট্টর ভারত পূজারী ছিল, বাংলাদেশকে আলাদা করাই এদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল। অপরদিকে খন্দকার মোশতাক ছিলেন পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক রেখে আঞ্চলিক অধিকার আদায়ের পক্ষপাতী। এদের মধ্যে এক দল ছিল সম্পূর্ন লেফটিস্ট। কিন্তু তাদের সামনে সত্যিকার কোন নেতৃত্ব ছিল না। এ - ধরনের সব দলের সমষ্টি ছিল আওয়ামী লীগ এবং সবাই নিজের মতামতের দিকে শেখ মুজিবকে টানতে চেষ্টা করতো। কারণ, শেখ মুজিব ততদিনে এক মহিরুহে পরিণত হয়েছেন। এটা আওয়ামী লীগেরই একটা প্রভাব বলতে হবে যে, শেষের দিকে প্রতিটি দলই আঞ্চলিক স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামকে নিজেদের ম্যানিফেস্টোর অন্যতম ধারা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। ছ'দফা আসলে কি ছিল, তা একজন সাধারণ লোক জানতো না। কিন্তু সে লোকেরাই তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। চারদিকে শুধু ছ'দফার গুনগাণ শোনা যেতো। মুশকিল হলো, আঞ্চলিক স্বাধিকার এবং স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। এভাবে ছ'দফার আন্দোলন শেষাবধি স্বাধীনতার শ্লোগানে রূপান্তরিত হয়।

আপনারা জানেন, আন্দোলনের মোকাবেলা আন্দোলন দিয়েই করতে হয়। আন্দোলনের প্রধান শক্তি হলো, তার আইডিওলজি। একটা চিন্তাধারাকে পরাজিত করতে চাইলে তার চাইতে বেশী উপাদেয় চিন্তাধারা বা দর্শন পেশ করতে হবে। এভাবে আওয়ামী লীগ তার অস্পষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে পাকিস্তান ভাংগার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের প্রতিটি পদক্ষেপ পাকিস্তানকে দু'টুকরো করার সপক্ষে মনে হচ্ছিল, এক মাতাল আবেগ এর পেছনে কাজ করছিল। তাদের মুখে পাকিস্তান ভাংগার বদলে কেউ যদি তখন 'পাকিস্তান বাঁচাও' ধ্বনি সযত্নে তুলে দিত এবং তা যদি অনুকূল হাওয়া পেতো, তাহলে তা-ও আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। অতএব, এই দানব গতিসম্পন্ন আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করার একমাত্র উপায় ছিল নির্বাচনে পরাজিত করা। কিন্তু শেষাবধি তা সম্ভব হয়নি।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক শক্তি কানায় কানায় বৃদ্ধি পাওয়ার একই মাত্র কারণ, আর তা হলো তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার কাহিনী বড় দরদ দিয়ে লোকদের শুনাতেন। পত্র-পত্রিকায় তা আবার ফলাও করে ছাপা হতো। শেষে কথা দাঁড়াল, পূর্ব পাকিস্তানের সহায়-সম্পদ পুঁজি বিনিয়োগ-এর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হজম করে ফেলছে। ফলে, এখানকার লোক দিন দিন গরীব হয়ে যাচ্ছে। এই প্রপাগান্ডাকে মিথ্যে প্রমাণিত করার জন্য আমরা ইসলামাবাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিশনের কাছে সঠিক 'ডাটা' চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কোনমতে তাদের টনক নড়েনি। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা মনে করতো, এতে কোন কাজ হবে না। রাজনীতিকেরা এটাকে আবার অন্য 'কালার' দেবে। অবশ্য কথাটা এক অর্থে সত্য ছিল । তবু যদি সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যেতো, তাহলে বিদেশী সাংবাদিকেরা বিভ্রান্ত হতো না এবং দেশের আবেগবিবর্জিত জ্ঞানী লোকেরাও সঠিক তথ্য পেতেন।

সেকালে জনসংযোগের মাধ্যমেও নানা আজগুবি খবর ছাপানো হতো। একবার খবরের কাগজে ছাপানো হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ প্রকল্পে ৫০ কোটি টাকার মতো খরচ হচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে একটি মৎস হিমাগার তৈরী হচ্ছে মাত্র ৫ লাখ টাকা খরচে। এ – ধরনের মুখরোচক খবর শেখ মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করতো সন্দেহ নেই। বারংবার উচ্চারিত এসব কথা মুর্খ লোকদের সাথে সাথে শিক্ষিত লোকেরাও বিশ্বাস করে। তারপর এ- ধরনের খবরও শোনা গেছে, ওখানকার মেয়েরা তিনটে কাপড় (শেলোয়ার, কামিজ, ওড়না) এবং এখানকার মেয়েরা মাত্র একটা (শাড়ী) কাপড় পরিধান করে। পোস্টার লাগানো হলো- ওখানে চাউল আট আনা, আর এখানে ২টাকা। এসব অতিরঞ্জিত কথার ওপর ভিত্তি করে দিন দিন পারস্পরিক ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শিথিল হতে থাকে।

এ-সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বর্ণনা করে ইসলামাবাদে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট প্রেরণ করি। আমি তাতে জানিয়ে দিয়েছি, এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার এই রিপোর্ট বড় বড় জেনারেলদের দৃষ্টি গোচর হয়। কর্নেল কাইউমও এ রিপোর্ট দেখেন ! তিনি তখন চীফ মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টার'-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বাংলা

সাহিত্যের দু জন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী ও কবীর চৌধুরীর ভ্রাতা কর্নেল কাইউম ছিলেন অন্য ধাঁচের লোক। তিনি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ঢাকা রেডিও' থেকে একবার বক্তৃতা করেছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানেই থেকে যান।

যে রিপোর্টটি প্রেরণ করা হয়েছিল, তা জেনারেল মোজাফফরউদ্দিনের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে। যদিও আগাগোড়া আমারই লেখা। রিপোর্ট প্রেরণের কিছুদিন পরই আমি 'চীফ – মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টারে' যাই। সেখানে আমি কর্নেল কাইউমকে জেনারেল করিম–এর সাথে আলোচনা করতে শুনলাম। বলাবলি করছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হতে চায়, এমন একটা সুস্পষ্ট আশংকা পেশ করলো, সে নেপথ্য লোকটি কে ? আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, সেই পাগল অফিসার আমিই। কিসের ভিত্তিতে এসব বললেন ? আমি তাকে বিস্তারিত আলামত ব্যাখ্যা না করে বললাম, আপনি ওখানে গিয়েছিলেন কতদিন আগে ? বললেন, চার পাঁচ বছর হবে। বললাম, তা'হলে এখন গিয়ে দেখুন, সহজেই অনুমান করতে পারবেন !

এক মাসের মধ্যে কর্নেল কাইউম ঢাকা এলেন এবং 'গভর্নর হাউজে' আমার সাথে মিলিত হলেন। বললেন, স্যার ! আপনি ঠিকই বলেছেন। এত পরিবর্তন আমি আগে লক্ষ্য করিনি। ঢাকায় অবস্থানকালে বিভিন্ন ধরনের লোকদের সাথে আমার মেলামেশা হয়। আমাকে অনেকেই বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তান আর কোনদিন একত্রে থাকতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হোসেন '৫৪ সালেই এই পরিণতির কথা বলেছিলেন। আইউব খান পূর্ব পাকিস্তান – এর নেতাদের কথায় কথায় একাধিকবার বলেছিলেন, আপনারা আলাদা হতে চাইলে আলাদা হয়ে যান। তাছাড়া এমন কথাও শোনা গেছে, '৫২ সালেই আলাদা হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে লোকদের মধ্যে। এ সময় জেনারেল রহিমও ঢাকাতে ছিলেন। তিনি একদিন কথায় কথায় আইউব খানকে বলেছিলেন, যা–ই বলুন, বাংগালীরা কোনদিনই আমাদের সাথে থাকবে না।

পূর্ব পাকিস্তানের লোকরা পাকিস্তানকে ভালবাসতো, ঘৃণাও করতো। তাদের যেটুকু ঘৃণা, তা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য– পাকিস্তানের জন্য নয়। এ–ব্যাপারে এটাই বোধহয় শেষ কথা, তাদের ঘৃনা ছিল – আমাদের প্রতি। আমি এব্যাপারে গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, আমাদের প্রতি তাদের এই ঘৃণা শেষাবধি পাকিস্তান বিরোধী ঘৃণায় কেন রূপান্তরিত হলো, তা আজো ভেবে পাই না। যত ভেবেছি, ততই নিজেদের অপরাধী মনে হয়েছে। পাকিস্তানের অপরিণামদর্শী ক্ষমতাসীন লোকেরা এসব কথার প্রতি কোন কর্ণপাত করেননি; বরং এদের উপর নির্যাতন চাপিয়ে দিয়েছেন।

আজ আমাদের দৃষ্টিভংগির পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। যদি এখনও আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি বলবৎ থাকে, তা'হলে এক অনাগত বিপর্যয় আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পাঞ্জাবের লোকেরা নিজেদেরকে পাকিস্তান বা পাকিস্তানের ঠিকাদার মনে করে এবং অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কে বলা হয়, এদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার বীজ রয়েছে। পাকিস্তানের উপর পাঞ্জাবীদের এই মোড়লীপনা কোন যুক্তিতেই খাটে না। হয়ত নানা বিচারে দেশের স্বার্থ নিয়ে

পাঞ্জাবীদের কথা বলার অধিকার রয়েছে, কিন্তু এর চাইতে বড় সত্য হলো, অতীতে পাঞ্জাব বড় বড় ভুল করেছে। জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সকল শ্রেণীর সকল অঞ্চলের লোকদের মতামত প্রণিধানযোগ্য ছিল।

প্রথম থেকেই আমার একটি মৌলিক প্রস্তাব ছিল 'পাকিস্তান বাঁচাও 'আন্দোলন' ধ্বনি তুলে এটাকে সহজেই জনপ্রিয় করে তোলা যেতো। তবে এর সামনে তিনটি বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা ছিল। প্রথম, শেখ মুজিব কোন দিনই স্পষ্টভাবে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেননি। তিনি তো বলেই বেড়াতেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল কেন আলাদা হতে যাবে? ছ'দফাতেও পাকিস্তানকে নাকচ করে দিয়েছে, এমন কোন ধারা নেই। এই পরিস্থিতিতে যদি এই ধ্বনি সোচ্চার হয়ে উঠতো, "পাকিস্তান খতরে মে হ্যায়, উছে বাঁচাও" তাহলে নিঃসন্দেহে সমর্থন পেতো। কিন্তু আওয়ামী লীগের একগুয়েমী চিন্তার জন্যই 'পাকিস্তান বাঁচাও' আন্দোলন জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হয়নি। এ-প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কারণটি হলো, সে সময় অন্যান্য দলগুলোও অল্প-বিস্তর আওয়ামী লীগের ধ্যান-ধারণা পুষ্ট ছিল। নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামী ছাড়া প্রায় সব দলই ছিল সেকুলার। আঞ্চলিক স্বাধিকারের ধ্বনি ওখানেও ছিল, এখানেও ছিল। লোকেরা ভাবতে লাগলো, স্বাধিকার-এর প্রশ্নে সব পার্টির আওয়াজ যখন একই, অতএব পি.ডি.পি. বা অন্য কোন দলে না গিয়ে আওয়ামী লীগেই যোগ দেয়াই ভাল। আর না হোক, আওয়ামী লীগের 'লিডার' সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। জনগণের এই 'লিডার' যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং জেল জুলুম সহ্য করেছে, তা বিরল। তার বীরত্বে সরকারী প্রশাসন থর থর করে কাঁপে। অবশ্য মওলানা ভাসানীও বিরাট প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু তাঁর কার্যক্রম ও চিন্তাধারায় কোন শৃঙ্খলা ছিল না। তাছাড়া বার্ধক্য এবং পরিবর্তনশীল মতের দরুন লোকদের মাঝে তার প্রতি আস্থা কমে গেছে। ন্যাপের পার্লামেন্টারী নেতা মশিউর রহমানও একজন বড় সোস্যালিস্ট, কিন্তু তার চতুর মনোভাব সম্পর্কে লোকেরা সচেতন ছিল। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ তার মতবাদ জনগণের হৃদয় পর্যন্ত পৌছাতে পারেন নি। এ ব্যাপারে তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা ছিল, আওয়ামী লীগের লোকদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। বৈদেশিক শক্তি তাদের মদদ যোগাত।

সম্ভবতঃ '৭০ সালের ১৭ই জানুয়ারীতে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার সূত্রপাত হলো। জামাতে ইসলামীর প্রথম নির্বাচনী জনসভা সন্ধ্যার দিকে পল্টন ময়দানে হবার কথা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এই সভায় ভাষন দেয়ার জন্য মওলানা মওদুদী এসেছেন। চারদিকের হাবভাব দেখে আমার মনে হচ্ছিল, আওয়ামী লীগ এই সভা লণ্ডভণ্ড করে দেবে। কিন্তু আমাকে ধারণা দেয়া হলো, এমনটি হবে না।

এ সময় ঢাকাতে মার্শাল ল'র দু'টো ' উইং' ছিল। প্রথমটি সম্পূর্ন সামরিক পর্যায়ের, দ্বিতীয়টি ছিল 'সিভিল এফেয়ার্স'। সিভিল এফেয়ার্সের দায়িত্ব ছিল আমার উপর এবং অপরটির দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মাজেদুল হক। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী (বর্তমানে মেজর জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপদেষ্টা)। সম্ভবতঃ ১৪বা ১৫ই জানুয়ারী তিনি আমাকে বললেন, পররাষ্ট্র দফতরে এক

গুরুত্বপূর্ন বৈঠক আছে, আমাকে যেতে হবে। কিন্তু আমার এক নিকটাত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে আমাকে ওখানে থাকতে হচ্ছে; আপনি বরং এই বৈঠকে যোগদিন। আমি তা মেনে নিলাম। এবং পরদিন ইসলামাবাদ পৌছেই খবর পেলাম, আওয়ামী গুণ্ডারা জামাতে ইসলামীর সভা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে এবং বহু লোক হতাহত হয়েছে।

ঢাকা ফিরে এসে জানলাম, পুলিশের লোকরাও আওয়ামী লীগের সাথে সহায়তা করেছে। ব্রিগেডিয়ার মাজেদুল হকের কাছে রিপোর্ট পৌছার পর তিনিও কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেননি; বরং এটাকে মামুলী ঘটনা বলে আখ্যা দেন। এখন মনে হচ্ছে, সভা পণ্ড করার জন্য আগাগোড়া সুপরিকল্পিত ভাবে মাজেদুল হকই আমাকে ইসলামাবাদ পাঠিয়েছেন। কারণ, আমি থাকলে এমনটি হতে পারতো না।

৭০ সালের ১লা জানুয়ারীতেই দেশের উভয় অংশে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। এরপর ২৯শে মার্চ 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' জারি করা হলো। এতে দু'টো ধারা বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ

১। কোন রাজনৈতিক দল ইসলাম ও পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিরোধী কান নির্বাচনী অভিযান চালাতেপারবে না।

২। জাতীয় পরিষদ যে শাসনতন্ত্র অনুমোদন করবে, তা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ছাড়া আইন হিসেবে পরিগণিত হবে না।

এই 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' এর ৫৫ নং উপবিধিতে ছিল প্যারিটির ভিত্তিতে দুটো প্রদেশ সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা। এতে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দুটো প্রদেশে চিহ্নিত করা হলো কয়েকটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিম পাকিস্তান শুধুমাত্র একটি প্রদেশের নামে আখ্যায়িত হবে, এটা নিয়ে সেখানে বাদ-প্রতিবাদ উঠল। তারপর দুটো প্রদেশ নিয়ে 'ওয়ান ইউনিট' এর বিভক্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠল। পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের প্রশ্নে দুটো ইউনিটের বিভক্তিকরণে ইয়াহিয়া খানের কোন অধিকার নেই বলেও কথা উঠল।

নির্বাচন সংক্রান্ত এই 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' ঘোষনা হওয়ার পর ছ'দফার আন্দোলন ও নির্বাচন অভিযান জোরদার করা হলো। এ- ব্যাপারে সর্বাগ্রে মৌলিক প্রশ্ন দাঁড়াল, ছ' দফা পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী কিনা! পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন চ্যানেল-এর ব্যাখ্যা চেয়ে ইসলামাবাদে খবর পাঠালো, কিন্তু এর সন্তোষজনক কোন সুরাহা হলো না।

এ সময় আমি একদিন রাওয়ালপিন্ডি পৌছলাম। ব্রিগেডিয়ার রহিম তখন মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টারে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। পরে প্রমোশন হওয়ার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানেও এসেছিলেন। আমি তার সাথে ছ'দফা নিয়ে আলোচনা করে বললাম, আওয়ামী লীগকে আর কতটুকু এগুতে দেয়া উচিৎ। তিনি আমাকে অস্পষ্টভাবে বললেন, আমরাতো সিন্ধুদেশ-এর পক্ষেও প্রপাগান্ডা

করতে দিতে রাজী। একথা শুনে আমি বুঝলাম রাওয়ালপিন্ডিতে বসে কর্তা ব্যক্তিরা কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করেন। তাই আমি আর এব্যাপারে বেশী অগ্রসর হলাম না। আমি মনে করেছিলাম, শেখ মুজিব কর্তৃপক্ষকে এব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করে বলেছেন, নির্বাচনটা হতে দিন। এরপর আমি ছ'দফায় সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা ব্যাখ্যা বা রদবদল করে নেব। এজন্য সরকার তার সম্পর্কে কোন বিধিনিষেধ আরোপ না করে বরং তার মর্জিমত সবকিছু চালাতে দেন।

এ–সময় দেশপ্রেমিক ও পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলোর জন্য আমি কিছু করার ফিকির করছিলাম। আর না হোক এ–সব লোকগুলো যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে সমভাবে প্রচারণা চালাতে পারে, সে সুযোগ থাকা উচিৎ। এ–ব্যাপারে আমি লেঃ জেনারেল পীরজাদার সাথে আলাপ করলাম। তিনি আমার কথা গুলো অনুধাবন করে বললেন, হ্যাঁ, এদের কিছু না কিছু সাহায্য সহযোগিতা করা উচিৎ। কিন্তু আমাদের সরকার যে নিরপেক্ষ। কোনক্রমেই কোন পক্ষ নেওয়া ঠিক হবে না। আমি জবাবে কিছু বললাম না। তবে মনে মনে বললাম, ন্যায় ও অন্যায়ের প্রতিযোগিতার সময় আমরা যদি এ ধরনের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করি, তাহলে তা অন্যায়ের পক্ষেই যেয়ে পড়বে। তারপরও আমি এ ব্যাপারে সচেষ্ট থেকে বিভিন্ন জনকে অনুপ্রানিত করার চেষ্টা করলাম পরে এমন এক পর্যায় এলো মেজর জেনারেল ওমর ও ইন্টেলিজেন্সের ডাইরেক্টর জেনারেল এন, এ, রিজভী বিভিন্ন শিল্পপতিদের উপর চাপ প্রয়োগ করে ২০/২২ লাখ টাকা যোগাড় করে ৫/৬টি দলের মধ্যে তা ভাগ করে দেন। কিন্তু এই অর্থনৈতিক সহযোগিতা তাদের কোন কাজে আসেনি। কারণ, এই ক্ষুদ্র দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য ব্যাপক। শেখ মুজিবের বিপরীতে এ সময়ে যদি শুধুমাত্র একটি দল থাকতো, তাহলে এই সহযোগিতা কিছুটা কাজে আসতো।

নির্বাচনে ৪/৫ মাস আগে ইয়াহিয়া খান একবার ঢাকায় এলেন। আমাকে ডেকে পাঠানো হল। তার পাশে বসেছিলেন, 'কাইউম লীগের' হাসান মাহমুদ। ইয়াহিয়া খান বললেন, 'ইনি অভিযোগ করছিলেন,তার দলের প্রতি নাকি তোমরা বিশেষ খেয়াল রাখছ না।' আমি বললাম, তার অভিযোগ সত্য নয়। আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমরা তা করছি।ওনাকে আমরা সহযোগিতাই বা কি করব ? নির্বাচনে 'কাইউম লীগ' ২/৩ টির বেশী আসন পাবে বলে মনে হয় না।' আমার জবাব শুনে হাসান মাহমুদ গোস্যা হলেন এবং বললেন, যে তার দল নিঃসন্ধেহে উৎরে যাবে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অভিযানের প্রতিদিন এক নতুন শক্তি ও জৌলুস প্রদর্শন করা হতো। দেশের গ্রামে গঞ্জে প্রায় প্রতিদিন মশাল মিছিল জয় বাংলা শ্লোগান আর 'নৌকা' প্রতীকের তোরণ নির্মান করা হতো। আওয়ামী লীগের জন্য সব চাইতে বেশী কাজ করেছে ছাত্ররা। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্দোলনে কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এ সবের শীর্ষে।

সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনও বিশেষ ভাবে শেখ মুজিবের সহযোগীতা করতে লাগল। শিক্ষিত সমাজ মনে করতো, স্বাধীনতার মধ্যেই তাদের জীবনের বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

আমলারা মনে করতো আমাদের আর ইসলামাবাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। সব কিছুই আমাদের হাতে এসে যাবে। বড় বড় পদ ও মন্ত্রীত্ব পেয়ে যাব অনায়াসে। অশিক্ষিত নাগরিকেরা অবশ্য এ সবের ধরা ছোয়ার মধ্যে ততটা ছিল না। এদের মধ্যে পাকিস্তানী মানসিকতা তখনো জিন্দা ছিল। পরবর্তী সময়ে এরাও সংক্রামিত হয়েছে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ছাত্রদের আবেগ সমৃদ্ধ বক্তৃতা শুনে। শেষের দিকে এমন হলো, পুরো সরকারী মেশিনারী যেন শেখ মুজিবের কব্জার মধ্যে এসে গেল। ভোটের সময় আওয়ামী লীগের বিরোধী লোকেরা পুলিং ষ্টেশনের কাছে যেতে পারতো না। পুলিং ষ্টেশনের এজেন্টরা এদের কাছ থেকে জোর করে আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোট আদায় করে নিতো। ভোটের সময় সেনাবাহিনীর লোকেরা দুরে থাকতো তাদের কাছে এসব ব্যাপারে অভিযোগ করায় তারাও কিছু করতে পারলো না। কারণ, তাদের ডিউটি ছিল বাইরে। ভেতরে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাদের ছিল না। এ সময় সেনাবাহিনীর প্রতাপ অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ছিল। এই নমনীয় ভাবের পেছনে একাধিক কারণ ছিল। প্রথমতঃ রাজনীতিকও শ্রমিক শ্রেণীকে প্রথম থেকেই বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ এখানে গর্ভনর এবং চীফ মার্শাল ল' এডমিনিষ্ট্রেটর এর মাঝে প্রশাসনিক ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়ে ছিল। গভর্ণর আহসান ছিলেন মার্জিত ও নরম প্রকৃতির লোক। আওয়ামী লীগের ব্যাপারে তার কোন আচরণে কঠোরতা প্রকাশ পায় নি। অনেকে অভিযোগ করে বলতো আহসান আওয়ামী লীগেরই লোক! আওয়ামী লীগের এই জোয়ারের সামনে আহসান একা উল্টাপাল তুলে কিইবা করতে পারতেন?

ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের আমলে একটা ভুল সিদ্ধান্ত পুর্ব পাকিস্তানের এই পরিণতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। তা হলো উচ্চপদস্থ অফিসারদের আন্তঃপ্রাদেশিক বদলী সংক্রান্ত ব্যাপারটি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে সেখানকার লোক এবং পুর্ব পাকিস্তানে এখানকার লোক থাকবে। উচ্চপদে এখানকার লোক ওখানে বদলী হবে না। ফলে এক অঞ্চলের অফিসারদের স্বভাবতই অপর অঞ্চলের জন্য বিদেশী বলে (আজীবন) মনে হতো।

সময় এবং পরিস্থিতি এক সময় অনেক লোকের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা সব ছাপিয়ে যায়। একদা কালাবাগের আমীর ও লেঃ জেনারেল বখ্‌তিয়ার রাণা যথাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানের গর্ভনর ও সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দেখতে দেখতে কালাবাগের আমীরের প্রভাব সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল এবং বখ্‌তিয়ার রানা ক্রমশঃ পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন।

লেঃ জেনারেল আজম খান পুর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি এখানকার ভাষা পর্যন্ত জানতেন না। কিন্তু মানুষের হৃদয়ের ভাষা রপ্ত করেছিলেন। পুর্ব পাকিস্তানের লোকেরা তাকে আপন লোক মনে করতো অথচ বাঙ্গালী গর্ভনর মোনেম খান দু'চোখে তাকে দেখতে পারতো না।

শেখ মুজিবের বিপুল নির্বাচনী বিজয় মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি আওয়ামী লীগ ১০২ টা আসন লাভ করতে পারে। সেপ্টেম্বরে পুর্বপাকিস্তানে বন্যা হলো ইয়াহিয়া খান এ কারণে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার পক্ষে

ছিলেন না। শেখ মুজিবও প্রথমদিকে নির্বাচন না পিছাবার জন্য বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার পর নির্বাচন দু'মাস পিছিয়ে নিতে সম্মত হন। এই দুই মাসের অবকাশে শেখ মুজিব প্রপাগাণ্ডা করে বেড়াতে লাগলেন যে বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয়। এই সুযোগে শেখমুজিব প্রার্থীদের তালিকা পুনরায় সংশোধন করেন।

নভেম্বর মাসে পুর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে যে ভয়াবহ জলোচ্ছাস এবং প্লাবন হানা দিয়েছে, ইতিহাসে তার নজীর মেলে না। ইয়াহিয়া খান এ সময়ে চীনে ছিলেন। ফেরার পথে উপদ্রুত এলাকা ঘুরেফিরে দেখেন এবংপশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। জলোচ্ছাসে মৃতদের সংখ্যা এবং ক্ষয় ক্ষতির পরিমান নিরুপন এখনো হয়নি। ইয়াহিয়া খান চলে যাওয়ার পর যে সব খবর ছাপা হতে লাগল তা ছিল অপরিসীম বিস্ময়কর। সেনাবাহীনির লোকেরা উপদ্রুত অঞ্চলে সেবাকার্য চালায় এবং রিলিফ তৎপরতায় নিয়োজিত হয়। সারা বিশ্ব সাহায্য সামগ্রী পাঠাতে লাগল। আওয়ামী লীগ এই সুযোগে গলা ফাটিয়ে বলে বেড়াতে লাগল, কোন হেলিকাপ্টার আসে না, ডাক্তার নেই সেবা তৎপরতা নেই। এখানকার লোক শৃগাল কুকুরের মতো মরছে, আর পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। এই জলোচ্ছাসের ঘটনা নিয়েও আওয়ামী লীগের লোকেরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে চরম প্রপাগাণ্ডায় ব্যাপৃত হয়। এবাররেও নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব উঠল, শেখ মুজিব বিরোধিতা করে বললেন, নির্বাচন পিছানো চলবে না। যদি তা হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ প্রানের বিনিময়ে আমরা লড়াই করবো। এই হুমকিতে ইয়াহিয়া খান ঘাবড়ে গেলেন। শেখ মুজিব বললেন শুধু মাত্র উপদ্রুত অঞ্চলে স্থগিত রেখে সর্বত্র নির্বাচন হোক। একথা শুনে অন্যান্য দলের লোকেরা নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়, এতে আওয়ামী লীগের আরো পোয়াবারো হলো।

নির্বাচনে দেদার জালভোটের কারসাজি চলে। এক আসনে শেখ মুজিবের বিপরীতে খাজা খয়েরুদ্দিন দাঁড়িয়েছিলেন। খাজা সাহেবকে পরাস্ত করার জন্য অন্য এলাকা থেকে হাজার হাজার লোক এনে জাল ভোট দেয়ার বন্দোবস্ত হলো। তাদেরকে রুখে দাড়াবার কেউ ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি জাল ভোট না হতো তাহলে এই আসনে শেখ মুজিবের ভরাডুবি হতো। আওয়ামী লীগের বিজয়ের পিছনে হিন্দু সংখ্যা লঘুদের বিরাট অবদান রয়েছে। জন সংখ্যার ২০ ভাগই এই হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের জন্য নির্বাচনে কোন প্রতিনিধিত্ব দাবী করেনি, অথচ পর্দার অন্তরালে তারা আওয়ামী লীগকে পৃষ্টপোষকতা দান করে।

নির্বাচনের কয়েকদিন আগে একটা চমকপ্রদ ঘটনা পরবর্তী ঘটনাবলীর আভাস বহন করে নিয়ে আসে। হঠাৎ ইয়াহিয়া খান জেনারেল হামিদ সমভিব্যাহরে ঢাকায় এলেন। উভয়ের পরনে ছিল বেসামরিক পোষাক। জেনারেল হামিদ এই প্রথম বারের মতো এখানে এলেন। মুহূর্তে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল ইয়াহিয়া খানের হাতে আর ক্ষমতা নেই। অচিরেই জেনারেল হামিদ ক্ষমতা হাতে নিচ্ছেন। এতে লোকেরা ধারনা নিলো, ইয়াহিয়া খান পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে নির্বাচন সম্পন্ন করতে চান। কিন্তু সেনাবাহিনীর একটা গ্রুপ নির্বাচনকে সাবোটাস করতে চান এবং জেনারেল হামিদ এদের পুরো ভাগে রয়েছেন।

করাচী যাত্রার প্রাক্কালে বিবিসির প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খানকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি আজও ক্ষমতায় আছেন ?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জলদগম্ভীর কন্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ এমন কোন শক্তি নেই, আমাকে ক্ষমতাচ্যুত্য করতে পারে।

এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে পরে সেনাবাহিনীতে ব্যাপক তদন্ত এবং এর রুট খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। লাহোর মার্শাল ল' এই তথ্য উদঘাটন করে। ঘটনাটা ঘটেছিল এভাবে একদিন রাত ১২টায় মাহমুদ আলী কাসুরী এ.পি.পির লোকদের ডেকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করেন ঃ

খবর শুনেছ কিছু ?

'কিসের খবর ?'

'জেনারেল হামিদ এখন ক্ষমতাসীন।'

হ্যাঁ

এ ধরনের গুজবের পেছনে একটা মস্তবড় মনস্তাত্বিক কারণ রয়েছে, যাতে করে ইয়াহিয়া খানের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হয়। এবং তিনি ভাবতে শুরু করেন যে ক্ষমতাচ্যুত করার একটা চক্রান্ত বোধ হয় চলছে। হয়তো বা সেনাবাহিনীতে তার নিরঙ্কুশ সমর্থন নেই।

যাক, গুজোব ছড়ানোর কাজতো হলো, এই সুযোগে মিঃ ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের মনস্তাত্বিক টানাপোড়ানের ফাঁকে কিছু সুযোগ করে নিলেন।পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই পাঠকরা তা আঁচ করতে পারবেন।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দু'টা আসন ছাড়া আর সবগুলোতে জয় লাভ করেছে। এই নিরঙ্কুশ বিজয়কে নস্যাত করার জন্য আমি জানপ্রান চেষ্টা করেছিলাম। আওয়ামী লীগের সাফল্য সম্পর্কে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ যে নীল নকশা একেছিলেন, বাস্তবে তা মিথ্যায় প্রতিপন্ন হলো। এজন্যে একজন সত্যিকার এডমিনিষ্ট্রেটরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন ষ্ট্রাটেজি গ্রহন করতে হয়। সম্ভাবনা এবং আশা কোনদিনই পুরণ হবার নয়।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর আমি এডমিরাল আহসানকে বললাম, 'এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করা দরকার, আপনিই এ ব্যাপারে যোগ্য ব্যাক্তি বলে আমি মনে করি।' তিনি বললেন, 'এর মধ্যে আর আমাকে টেনে কি লাভ? এ ব্যাপারে সরাসরি ইয়াহিয়া আলাপ করলেই ভাল করবেন।'

তার জবাব শুনে আমি জেনারেল ইয়াকুবকে এ ব্যাপারে বললে তিনি জানালেন, আমি হলাম সামরিক প্রশাসক, রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আমার আলাপে কাজ কি?' আমি বললাম 'তাহলে আমাকে ময়দানে নামিয়ে দিন, আপনার আর কোন রিস্ক থাকবে না।' মুজতবা হোসেন নামে আমার এবং শেখ মুজিবের এক ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাকে একদিন বললাম, 'তোমার বাড়ীতে একদিন আমাদের দু'জনকে চায়ের দাওয়াত দাও।' তাই করা হলো। শেখ মুজিব আমাকে দেখেই অভিযোগ করে বললেন, 'জেনারেল সাহেব! আপনিতো আমার ভীষন বিরোধীতা করছেন।' আমি

বললাম, ' বিরোধীতা নয় সহযোগীতা করছি বরং।' কিন্তু আমার ইচ্ছা ফলবতী হলো না। শেখ বললেন, 'আমরা পরাজিত হলেই আপনি খুশী হতেন, আমি বললাম, 'আমি চেয়েছিলাম আপনার ভাগ্যে যেন এত ভোট না পড়ে, যাতে করে আপনি জনগনের গোলাম হয়ে যান। এত বেশী ভোট পাওয়ার পর আপনি এখন আর স্বাধীন জননেতা হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। আপনি ব্যক্তিত্ব আর নেতৃত্বকে একীভূত করে ফেলেছেন।' শেখ সাহেব হেসে উঠে বললেন, 'যুক্তিতো মন্দ না তবে আপনি বিরোধীতা করেছেন।'

নানা কথার পর আমি ছ'দফার আলোচনা তুললাম। তিনি বললেন 'চলুন একটা একটা করে আলাপ করি।' আমি বললাম, 'দুটো পয়েন্ট তো খুবই আপত্তিজনক। দুটো প্রদেশের আলাদা কারেন্সী এবংআলাদা ষ্টেট ব্যাংক এর প্রস্তাবটা খুবই আপত্তি জনক।' শেখ মুজিব উদাহরণ পেশ করে বললেন, 'এতে দোষটা কোথায় ? ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড তো একই রাষ্ট্র কিন্তু তাদের ওখানে তো আলাদা কারেন্সী এবং ষ্টেট ব্যাংক রয়েছে।' আমি বললাম, 'সে দেশের সাথে আমাদের যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সেখান কার রাজতন্ত্র প্রথা তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে রেখেছে। এখানে উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দারুন ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। স্কটল্যাণ্ডে প্রচুর তৈল সম্পদ আবিস্কৃত হয়েছে, রাজতন্ত্র সেখানে এখন টলটলায়মান। চাকুরী বাকুরী নেই দেখবেন, স্কটল্যাণ্ড অচিরেই স্বাধীনতা দাবী করবে। আমার কথা শুনে শেখ মুজিব বললেন, আসলে এটা নিয়ে খুব বেশী ভাবনা চিন্তা করার কিছু নেই। আমি এক কারেন্সীর ব্যাপারে ইতিমধ্যে একমত হয়েছি এবং অন্যান্য গুলোও সংশোধন করে নেব। এরপর আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টে এলাম। বললাম–যদি দেশ আলাদা হয়, তা'হলে বৈদেশিক বাণিজ্য কিভাবে হবে ? মনে করুন, বাংলাদেশ চীনের সাথে, বেলুচিস্তান রাশিয়ার সাথে, পাঞ্জাব আমেরিকার সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের চুক্তি করল; তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে ? তা'হলে দেখা যাচ্ছে এতে কেদ্র বলে কিছু থাকছে না এবং একের পর এক সমস্যা সৃস্টি হবে।

এ প্রশ্নের তিনি কোন জবাব দিতে পারলেন না। একটু পরে বললেন, আসলে আমাদের অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকবে।

এরপর এলো বাংলাদেশের কথা। তিনি বললেন, পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই আমরা প্রদেশের আলাদা নাম 'বাংলাদেশ' রাখব এবং এর আলাদা পতাকা হবে। আমি বললাম, এ ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ গোঁজামিল মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, আমেরিকাতে প্রতিটি রাজ্যের আলাদা পতাকা আছে। একই সঙ্গে তারা রাজ্যের ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। আমরাও বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের পতাকা ওড়াব। এই 'লজিক' আমার বোধগম্য হলো না। অবশেষে আমি বললাম, আমেরিকা এবং পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের মাঝে আকাশ–পাতাল পার্থক্য রয়েছে। আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো আগে থেকেই স্বাধিকারপ্রাপ্ত এবং কন্‌ফেডারেশনের মাধ্যমে তারা জাতীয় ঐক্য রচনা করেছে।

শেখ সাহেবের সাথে আমার এই আলাপ–আলোচনা লিখিত রিপোর্ট হিসেবে আমি জেনারেল

ইয়াকুবের কাছে পেশ করি। এতে আমার নিজস্ব মন্তব্য যোগ করে বললাম, শেখ মুজিবের সাথে জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু উপরওয়ালা সামরিক কর্তা ব্যক্তিরা এই রিপোর্টকে কিভাবে গ্রহণ করলেন, জানতে পারলাম না।

ডিসেম্বরে বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, আওয়ামী লীগ ১৩৮-এর স্থলে ৮১ আসন লাভ করে।

দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে, এরপর ভুট্টো এবং শেখ মুজিবের সম্পর্ক ক্রমে তিক্ত হয়ে উঠল। ভুট্টোই প্রথম উস্কানীমূলক বিবৃতি দিতে শুরু করেন। এক বিবৃতিতে তিনি বললেন, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু রয়েছে আমার পকেটে। এ দু'টো এলাকাই দেশের আসল শক্তির উৎস। আমার দলের সহযোগিতা বা সমর্থন ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র তৈরী সম্ভব নয়। পরদিন শেখ মুজিব পাল্টা বিবৃতি দিলেন, শাসনতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় কেবিনেট তৈরীর মতো পজিশন আমার রয়েছে।

এভাবে দু'জন দু'জনের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন এবং দিন দিন উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে লাগল। শেষের দিকে অবশ্য ভুট্টো অনুভব করলেন, এতে সুবিধে হবে না, তাই ডিসেম্বর-এর শেষের দিকে তিনি বললেন, আমি আওয়ামী লীগের সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে অনুমোদন করি। এরপর ভুট্টো জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ঢাকা এলেন এং শেখ মুজিবের সাথে সৌহার্দমূলক বৈঠক করলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা নিয়েই শাসনতন্ত্র তৈরী করা হবে বলে বৈঠকে শেখ মুজিব মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবের সাথে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আমার যেসব কথাবার্তা হয়েছে, তাতে পাকিস্তানের ঐক্য বিনষ্ট হবে, এমন কোন ধারা ছ'দফাতে রাখা হবে না বলে তিনি কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ৩রা জানুয়ারী ঢাকাতে আওয়ামী লীগের নব নির্বাচিত সদস্যদের যে, 'র‍্যালি' হয়েছিল, তাতে খোদা, শহীদান, কৃষক-শ্রমিকদের নাম নিয়ে শপথ নেয়া হয় যে, ছ'দফা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা এলেন। তাঁর সাথে অন্যান্য ডাকসাইটে জেনারেলরাও ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আওয়ামী লীগের আসল মতলব যাচাই করা। এবারের আলোচনায় এড্‌মিরাল আহসানও উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বারবার আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য বৃথা সময় অপচয় করেছেন। লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক জারি হওয়ার অব্যবহিত পরেই এ-ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হওয়ার দরকার ছিল। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের পর শেখ মুজিবের পজিশন এত উপরে উঠেছে যে, তাকে আর নিচে নামানো সম্ভব ছিল না।

ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক শুরু হলো। ইয়াহিয়ার পক্ষে জেনারেল পীরজাদা এবং গভর্নর আহসান ছিলেন। অপরদিকে শেখ মুজিবের পাশে ছিলেন, খন্দকার মোশতাক, তাজুদ্দিনের মত বড় বড় পাঁচজন নেতা। বৈঠকে অনেক কথাবার্তা হলো। পরে ইয়াহিয়ার 'মুড' দেখে মনে হলো, আলোচনা সন্তোষজনক চলেনি। পরে জানা গেছে, শাসনতন্ত্র তৈরীর ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে

নিয়েই শেখ কাজ করবেন এবং এসেমব্লিতে পেশ করার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষকে তা দেখানো হবে বলে শেখ কথা দিয়েছেন। এটাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে সকল দলের ঐক্য পরিলক্ষিত হলেই এসেমব্লি ডাকা হবে।

১৮ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমান বন্দরে সাংবাদিকরা নানা প্রশ্ন করেন। প্রতি কথায় তিনি অচিরেই ক্ষমতা ত্যাগ করবেন বলে আভাস দিয়েছেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, এ–ব্যাপারে বরং শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করুন, তিনিই তো ভাবী প্রধানমন্ত্রী।

ঢাকা থেকে চলে যাবার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জেনারেল হামিদ ও জেনারেল পীরজাদাকে নিয়ে লারকানাতে শিকার করতে গেলেন। এই সুযোগে ভূট্টোর সাথে রাজনৈতিক আলোচনাও কিছু করলেন। এই আলোচনার বিস্তারিত কিছুই জানা যায় নি। তবে পূর্ব পাকিস্তানে তখন এই শিকার–কাহিনী নিয়ে বেশ জল্পনা–কল্পনা হয়।

এ–ধরনের সন্দেহ এবং দ্বিধার পরিবেশে ভূট্টো তার আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ঢাকা এলেন এবং তিন দিন বেশ আলাপ–আলোচনা চলল। শেষে ভূট্টো বিবৃতি দিলেন, আমি ছ'দফার ব্যাপারে সাড়ে পাঁচ দফা পর্যন্ত একমত হয়েছি, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের বুঝিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে। আওয়ামী লীগের সাথে আরো আলাপ–আলোচনা করার জন্য অচিরেই আমি আবার ঢাকা আসছি।

৩০ শে জানুয়ারী ভূট্টো লাহোর রওয়ানা হয়ে গেলেন। এটা ছিল সেই দিন, যেদিন ভারতীয় বিমান অপহরণ করে আনা হয়েছিল। ভূট্টো এই বীর জোয়ানদের খুব সহযোগিতা করেন এবং ২/১ দিন পর বিমানটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সিংহল দিয়ে বিমান আসা–যাওয়া করতো।

এর এক সপ্তাহ পর শেখ মুজিব–এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার মুখে ভূট্টো সম্পর্কে যে বিবরণ শুনলাম, তা বিশেষ উদ্বেগজনক ছিল। ভূট্টো নাকি ছ'দফার আলোচনা রেখে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী পরিষদ গঠনের ব্যাপারে আলাপ করেন। ভূট্টো বলছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হিসেবে আপনি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করুণ, আমাকে শুধু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষমতাটুকু দিন। শেখ সাহেব বললেন, আমি ভূট্টোর এ প্রস্তাব নাকচ করে দিই। কেননা, আমি আশংকা করছিলাম, ভূট্টো নিজেই প্রেসিডেন্ট হবেন এবং কৌশলে আমাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে সরিয়ে দেবেন।

সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারীর ৫/৬ তারিখে রাওয়ালপিন্ডি থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম এলো যে, শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দাও। আমি শেখ সাহেবকে বললাম, প্রেসিডেন্ট আপনাকে স্মরণ করেছেন, দয়া করে আপনি একটু ইসলামাবাদে পদধূলি দিবেন। শেখ সাহেব বললেন, মাত্র তিন সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্টের সাথে আমার সকল বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হয়েছে, এখন আর নতুন কি কথা থাকতে পারে? আমি বললাম, নিশ্চয়ই এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে, যে জন্য আপনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, কিন্তু আমি

যে আমার বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করছি, আপনি প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দিন, আমি এসময় আসতে পারব না।

শেখ মুজিবের উক্তি আমি প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দিলাম। এর এক দু'দিন পরই পূর্ব পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রী এবং মেজর জেনারেল করিম ঢাকা এলেন। বলা বাহুল্য, জেনারেল করিম ছিলেন বাঙ্গালী। জেনারেল করিম শেখ সাহেবকে রত করার চেষ্টা করেন, আমিও তাকে খুব বোঝালাম। শেষ অবধি তিনি রাজী হলেন। তিনি বললেন, শাসনতন্ত্রের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের এক্জিকিউটিভ কমিটির একটা সভা হচ্ছে, এটা হলেই আমি ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিন্ডি যেতে পারি। ইতিমধ্যে ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে ভুট্টো এক বক্তৃতায় বলে বসলেন, ঢাকা পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য বধ্যভূমি হবে। শেখ মুজিব আমাকে টেলিফোন করে চরম অস্থিরতা প্রকাশ করে বললেন, ঢাকা যদি ভুট্টোর জন্য বধ্যভূমি হবে, তবে পশ্চিম পাকিস্তান আমার জন্য হবে 'জবাইখানা'। আমি আর রাওয়ালপিন্ডি যাব কি করে? মুজিবের সহগামী লোকেরা এর সাথে যোগ করে বলল, ওরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে বৈরুতে বিষ খাইয়ে মেরেছে, শেখ মুজিবকেও নিয়ে হোটেল ইন্টারকনে গোপনে হত্যা করার মতলব আঁটছে।

এসব বিবৃতিতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গেল। এরপর একদিন শেখ মুজিব বলে বসলেন, প্রেসিডেন্ট-এর ঢাকা আসা উচিৎ, কেননা, ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবে, তখন আমরা তাকে শাসনতন্ত্রের খসড়া দেখাব।

শেখ মুজিব রাওয়ালপিন্ডি যেতে পারবে না বলার পর ২০শে ফেব্রুয়ারী আমাকে রাওয়ালপিন্ডিতে ডেকে পাঠানো হলো। ২২ তারিখে সকল গভর্নর, সামরিক প্রশাসকদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা। আমি দু'দিন আগে পৌঁছেই প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করলাম। এটা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ছিল। তাঁকে ভীষণ ক্ষিপ্ত মনে হলো। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, বদমাশটাকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। সে কি মনে করেছে ? এখানে না এসে সে আমাকে দারুণ অপমাণ করেছে, আমার শক্তিকে সে 'চ্যালেঞ্জ' করেছে।

আমি তাঁকে কথার প্রতিবাদ করে বললাম, মুজিব সবেমাত্র বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ভোটে জয়লাভ করেছে, এখনই বদমাশটাকে শিক্ষা দেওয়া ঠিক নয়। সামনে এখনও অনেক পর্য্যায় রয়েছে। প্রথম পর্য্যায়েই আমি আপনাকে কঠোর পদক্ষেপের সুপারিশ করলাম। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রয়েছে, শাসনতন্ত্র অনুমোদন-এর সময়। প্রয়োজন হলে এসেমব্লিতে এই শাসনতন্ত্রের যথার্থতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক তোলা যায়। এখানেও আপনাকে আমি ধৈর্য ধরার অনুরোধ করব। প্রয়োজন হলে, লোকেরা এই প্রশ্নে 'ওয়াক আউট' করবে। এরপরও যদি আওয়ামী লীগ গায়ের জোরে শাসনতন্ত্র পাস করিয়ে নিতে চায়, তখন আপনি 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন। আমি এখানে এসেও আপনাকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দেব। আপনি ক্ষমতা তার কাছে হস্তান্তর করুণ, দেখবেন- ছ'মাসের মধ্যে তিনি তার জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক শক্তি হারাবেন। এ সময় যখনই তিনি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো বিনষ্ট করতে চাইবে, তখন পাকিস্তানের

কমান্ডার–ইন–চীফ যে–কোন পদক্ষেপ নিতে পারবেন। একমাত্র তখনই সেনাবাহিনীর সর্বশক্তি প্রদর্শন সময়োচিত হবে।

ইয়াহিয়া খান আমার কথা ধৈর্য সহকারে শুনছিলেন। শেষে বললেন, আপনার কথায় আমি একমত। কিন্তু আমি শেখ মুজিবের ওপর থেকে সকল আস্থা হারিয়েছি। আমি শেষবারের মতো তার বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে চাই।

আমি ইয়াহিয়া খানকে ইতিপূর্বে এত উত্তেজিত কখনও দেখিনি। মুজিবের ব্যাপারে হঠাৎ এত বেশী উত্তেজিত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? ইতিপূর্বে তো তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সকল বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। আমার হঠাৎ মনে হয়েছে, এর পেছনে ভুট্টোর কারসাজি রয়েছে। পরে জাতীয় পরিষদে ভূট্টোর বক্তৃতায় তা প্রকাশও পেয়েছে।

আমি ইয়াহিয়া খানকে বললাম–এখন দেখছি, পূর্ব পাকিস্তানে রক্তাক্ত পরিণতি ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। আপনি যদি জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবী করতে চান, তা'হলে যে–কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। যদি তাই করতে হয়, তা'হলে সর্বাগ্রে 'প্রেসের' উপর কঠোর বিধি–নিষেধ আরোপ করতে হবে। ইয়াহিয়া খান বললেন, তাই হবে। জাতীয় পরিষদের বৈঠক মূলতবী হওয়ার ঘোষণা হলো, কিন্তু 'প্রেসের' উপর বিধি–নিষেধ আরোপ করা হলো না।

প্রেসিডেন্টের সাথে কথা শেষ করে আমি বেদনাভরা বুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম, অন্য কারো সাথে একটু দেখা করা যাক। জেনারেল ওমরের কাছে গেলাম। তিনি প্রেসিডেন্টের একান্ত বিশ্বস্তদের অন্যতম ছিলেন। এ–ব্যাপারে তার সাথে দেড় দু'ঘন্টা আলাপ হলো। এছাড়া আরো ক'জন গুরুত্বপূর্ণ লোকদের সাথে আলাপ করি। কিন্তু মুলতবী সিদ্ধান্তের নড়চড় হলো না।

২২শে ফেব্রুয়ারী গভর্নর ও এডমিনিস্ট্রেটরদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হলো। জেনারেল ইয়াকুব আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেখানে, কিন্তু পীরজাদা বাদ সাধলেন।

আমি, গভর্নর আহসান ও জেনারেল ইয়াকুব 'ইস্ট পাকিস্তান হাউজে' উঠেছিলাম। জেঃ ইয়াকুব বৈঠকের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন। বললেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী এক মারাত্মক পদক্ষেপ বলে আমরা তিনজনেই মনে করি। রক্তাক্ত সংঘর্ষ এবং 'মিলিটারী অপারেশন' অনিবার্য। মিলিটারী অপারেশন পাকিস্তান ধ্বংসের প্রধান কারণ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের এই আলোচনার পুরো বৃত্তান্ত একটা কাগজে লিপিবদ্ধ করে নিলাম। তাতে এ–ও বলা হলো, এই পরিস্থিতিতে আমরা ভারতের ব্যাপারেও উদাসীন থাকতে পারি না। আমরা এভাবে ধ্বংশের পরীক্ষায় তলিয়ে যেতে পারি না। এসব লিখে কাগজ খানি জেনারেল পীরজাদাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

আমার উপর হুকুম হলো, আমি যেন তাড়াতাড়ি ঢাকা চলে যাই। সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্ট ও তাঁর উপদেষ্টাদের মতে আমার পিন্ডি অবস্থান সন্তোষজনক ছিল না। আমি ঢাকা চলে এলাম। গর্ভনর আহসান ও জেনারেল ইয়াকুবও ঢাকা এলেন ২৬ তারিখে। তারা এসে শোনালেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবীর ঘোষনা ২৮ তারিখে হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এ–

ব্যাপারে নিজেদের মতামত কিছু ব্যক্ত করেন নি? বললেন, অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত অটল রয়েছে। প্রেসিডেন্ট আমাদের বল্লেন, আপনাদের কথা যুক্তিযুক্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা ভুট্টোকেও উপেক্ষা করতে পারি না। তিনি এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা, এবং সেনাবাহিনীও এখনকার লোক দিয়ে গঠিত।

মিঃ ভুট্টো এ সময় করাচীতে ছিলেন। আমি এবং জেনারেল ইয়াকুব তার সাথে দেখা করে বললাম, জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবী হলে পরিস্থিতি ভীষন বিগড়ে যাবে, গেরিলা যুদ্ধ হবে, সেনাবাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যরা বিদ্রোহ করবে–সর্বোপরি 'সিভিলওয়ার' শুরু হবে। মিঃ ভুট্টো আমাদের কথাবার্তা এবং যুক্তিতর্ক মনযোগ সহকারে শুনলেন এবং শেষে বলে উঠলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে এমন কিছুই হবে না। আওয়ামী লীগ এক বুর্জোয়া পার্টি। তাদের মধ্যে এ–ধরনের আন্দোলন বা সেনাবাহিনী মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা নেই।

ভুট্টোর এ–ধারা জবাব শুনে আমি পিণ্ডি এলাম এবং প্রেসিডেন্টকে ভুট্টোর উক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম। প্রেসিডেন্ট চিন্তান্বিত হয়ে বললেন,আমি এখন আর কি করতে পারি? মুলতবী সিদ্ধান্ত আর কোন ক্রমেই পাল্টানো সম্ভব নয়।

এরপর আমি নতুন নির্দেশ নিয়ে ঢাকা ফিরে এলাম। নতুন নির্দেশটি ছিল, অধিবেশন মূলতবী সিদ্ধান্ত ঘোষণার একদিন আগে শেখ মুজিবকে তা জানিয়ে দিতে হবে।

মিঃ ভুট্টো ক্ষমতা লাভের জন্য সন্তর্পণে এগুচ্ছিলেন। মুলতবী ঘোষণা ২৮ তারিখে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একদিন দেরী হয়ে গেল, যেহেতু ২৮ তারিখে ভুট্টো লাহোরে 'মিনারে পাকিস্তানে'র পাদদেশে এক জলসায় ভাষণ দেন। এই সভায় ভুট্টো অধিবেশন মুলতবীর দাবী তোলেন এবং সবাইকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, যদি কোন সদস্য এখান থেকে ঢাকা যেতে চায়, তাহলে তাদের পা ভেংগে দেয়া হবে ।

এ রাতেই শেখ মুজিবকে খবরটি পৌছানোর কথা ছিল, কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন একদিন আগে তা না বলার পক্ষে মত পোষন করছিলেন। কারণ, এতে আওয়ামী লীগ লোক জড়ো করে হাঙ্গামা শুরু করবে। পিণ্ডিতে অবস্থানকারী সেনাধ্যক্ষরা কেন যে একদিন আগে খবরটা জানানোর পক্ষে মত পোষণ করছিলেন, অদ্যাবধি আমার তা বোধগম্য হয়নি।

যাক, পরিকল্পনানুযায়ী সন্ধ্যে ৭টায় শেখ মুজিবকে 'গভর্নর হাউজে ডেকে পাঠানো হলো। গভর্নর আহসান প্রথমে একথা সেকথা বললেন, পরে প্রেসিডেন্টের মুলতবী সিদ্ধান্তটি তাকে জানানোর পর তিনি হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন। বেশ সংযত হয়েই বললেন, এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক। নি:সন্দেহে আমাদের সাথে প্রতারণা করা হলো। আমাদের পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে ফেলা হলো। শেখ মুজিবের সাথে আরো দু'জন লোক ছিল, তিনি তাদের সরিয়ে দিয়ে একা থেকে গেলেন।পরে বললেন, অধিবেশনের নতুন একটা তারিখ যদি এ মাসেই ঘোষনা করা হয়,তাহলে জনসাধারনকে নিরস্ত করা যাবে । আপনি দয়া করে মুলতবী ঘোষনার পর পরবর্তী একটা তারিখও একসঙ্গে ঘোষণা করার জন্য প্রেসিডেন্টকে বলুন।

এই একটি ঘটনা থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, শেখ মুজিব পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর যদি মতলব খারাপ থাকতো, তা'হলে নতুন তারিখ কেন চাইতে যাবেন তিনি ?

এড্‌মিরাল আহসান রাত ১০টায় পিণ্ডিতে জরুরী 'সিগন্যাল' পাঠালেন। এতে শেখ মুজিবের উক্তি ও নতুন তারিখ ঘোষণার উল্লেখ ছিল। এই সিগন্যালের কোন জবাব এলো না। বরং পরদিন দুপুর ১টায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক মুলতবীর ঘোষণা হলো রেডিওতে। আমরা ভেবে বিস্মিত হলাম, এই ঘোষনাটা ইয়াহিয়া খান নিজের কণ্ঠে কেন করলেন না ?

এই ঘোষনা শুনতেই ঢাকাতে দক্ষযজ্ঞ বেঁধে গেল। ইডেন বিলিডিং ও রাস্তাঘাট বিরান মনে হলো। এ সময় ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছিল। খেলা রেখে মারপিট শুরু হলো। চেয়ার মারামারি করে বেশ কিছু লোক হতাহত হলো। নবাবপুরের দিকে বাড়ি বাড়ি অগ্নিকাণ্ড চলল। বিহারিদের উপর হামলা শুরু হলো এবং সন্ধ্যার দিকে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেল।

শেখ মুজিব সন্ধ্যাতেই এক জমকালো সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর অসম্ভব বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। আমাদেরকে এই অন্যায় রুখে দাঁড়াতে হবে। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ২রা মার্চ ঢাকাতে এবং পরদিন সারাদেশে হরতাল আহবান করেন। এরপর ৭ই মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় আগামী কর্মপন্থা ঘোষণা করা হবে বলে জানান।

এরপর তিনি সেনাবাহিনীর লোকদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য 'গভর্নমেন্ট হাউজে' চলে আসেন। এখানে এসে তিনি বিনীতভাবে বললেন, আজ রাতের মধ্যে যদি পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হয়, তা'হলে আমি লোকদের উত্তাল আবেগ আয়ত্তে আনতে পারব, অন্যথায় আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না।

আমরা তিনজনই এই নাজুক পরিস্থিতি সামলাবার ব্যাপারে হন্যে হয়ে উঠলাম। অনেক চিন্তাভাবনার পর এড্‌মিরাল আহসান পিণ্ডিতে এক তারবার্তা পাঠালেন। তা ছিল নিম্নরূপ ঃ আই বেগ অফ্ ইওর এনাউন্স এ নিউ ডেট্ টুনাইট। টু মরো উইল বি টু লেট।

তারবার্তা প্রেরণের পর টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা চলল। কিন্তু কোনক্রমেই ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগাযোগ হলো না। অবশ্য পীরজাদার সাথে আলাপ হলো। এরপর আমরা জেনারেল হামিদের সাথে শিয়ালকোটে যোগাযোগ করলাম, ব্যাপারটি নিয়ে যাতে প্রেসিডেন্টকে বোঝাতে পারে। তিনি আমাদের কথা দিলেন, তিনি তা করবেন।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় বিশেষ টেলিফোনের ঘন্টি বেজে উঠল। মনে হলো, পীরজাদা লাইনে আছেন। জেনারেল ইয়াকুব–এর সাথে কথা বলতে চান। তিনি 'রিসিভার' তুলে নিলেন। পীরজাদা বললেন, এই মুহূর্তে আহসানকে পদচ্যুত করা হলো, তার বদলে আপনাকে গভর্নর করা হলো।

পূর্ব পাকিস্তানের শহরে–বন্দরে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছিল।১২ই মার্চ সৈন্য তলব করা হলো। 'গভর্নর হাউজে' মিছিলকারীদের হামলা চলছিল। সৈন্যদের গুলি না চালানোর জন্য কঠোর–ভাবে

নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের হামলা প্রতিহত করার জন্য বাধ্য হয়ে সৈন্যদের গুলি চালাতে হয়, এতে ৬ জন নাগরিক মারা যায়।

মানুষের এহেন রুদ্র মুর্তিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দেওয়ার জন্য শেখ মুজিব এখানে–সেখানে জালাময়ী বক্তৃতা দিতে লাগলেন। সংঘর্ষ বেড়েই চলল, রাস্তাঘাটে রক্তগঙ্গা বয়ে চলল, শান্তির সকল উদ্যোগ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জেনারেল ইয়াকুব পিণ্ডিতে তার পাঠালেন। ধরপাকড়–এর জন্য সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি নিয়োজিত করার অনুমতি প্রার্থনা করা হলো। ইয়াহিয়া খান জানালেন, আপনার উপর সম্পূর্ন আস্থা আছে আমার। আমার হুকুমের অপেক্ষা না করে প্রয়োজনবোধে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্মপন্থা গ্রহন করবেন।

এর প্রতিউত্তরে জেনারেল ইয়াকুব পুণরায় তারবার্তা পাঠিয়ে বললেন, আপনি (প্রেসিডেন্ট) ঢাকা আসুন এবং একটা রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করুন। পিণ্ডি থেকে গোপনে পয়গাম এলো, প্রেসিডেন্ট ১০ তারিখে নেতাদের সাথে আলাপ–আলোচনার জন্য আসছেন। এ–ব্যাপারে শেখ মুজিবের সাথে অগ্রিম খবর দেবার জন্য বলা হলো। শেখ মুজিব এতে সম্মত হলেন। পরে তিনি আবার বললেন, তিনি কোন 'রাউণ্ড টেবিল' কনফারেন্সে বসতে রাজী নন।

সেনাবাহিনী মাত্র ২ দিন শহরে টহল দিয়েছিল। এরপর আওয়ামী লীগের পীড়াপীড়িতে তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হলো। শেখ মুজিব ঘোষনা করলেন, শান্তি–শৃংখলা পরিস্থিতি আমি দেখব। আমার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও পুলিশ–আনসার শান্তি–শৃংখংলার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

মার্চের ৪/৫ তারিখে এড্‌মিরাল আহ্‌সান পশ্চিম পাকিস্তানে রওয়ানা হয়ে যান। জেনারেল ইয়াকুব তাকে সংক্ষিপ্তভাবে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। এই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিতি ছিলাম। এমন সময় পিণ্ডি থেকে পীরজাদার ফোন এলো। আমরা শুধু 'ইয়েস স্যার' শুনলাম। শেষে শুনলাম, যদি তাই হয়, তাহলে আমার পদত্যাগ গ্রহন করুন। সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং জেনারেল খাদেম রাজাও পদত্যাগের কথা বললাম। জেনারেল ইয়াকুব বললেন,আমারা তিনজনই যদি একসঙ্গে পদত্যাগ করার কথা বলি, তাহলে বিদ্রোহের অভিযোগে পড়ব।

জেনারেল পরে জানালেন যে, ইয়াহিয়া খান ঢাকাতে আসতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বললেন, আমার আসল ভিত্তি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান। আমি সেখানকার লোকদের নারাজ করতে পারব না।

আমাদের সকলের অভিমত ছিল, প্রেসিডেন্টের এখানে আসার বিশেষ দরকার। আমরা এসব কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় ফোন এলো এবং বলা হলো, রাও ফরমান আলীকে সত্বর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দাও।

তখন রাতের এগারটায় করাচীতে শেষ ফ্লাইট যেতো। হাতে তেমন সময় ছিল না। আমি 'এয়ার পোর্টে খবর পাঠালাম আমার জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। হঠাৎ খেয়াল এলো. যাবার আগে

একবার শেখ সাহেবের সাথে দেখা করে গেলে বোধ হয় ভাল হবে। ফোনে যোগাযোগ করা হলে শেখ সাহেব বললেন, এক্ষুনি চলে আসুন।শহরে গুলি চলছিল। হৈ চৈ চলছিল, এরই মধ্যে আমি ছোট গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শেখ সাহেবের বাড়ীতে ঢুকেই আমি বললাম, পাকিস্তানকে বাঁচনোর জন্য শেষবারের মত এখনো কোন তদবির করা যায় কি? তিনি জবাবে বললেন, বাঁচতে পারে। তবে এ– ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার জন্য আমার মানসিক অবস্থা থাকতে হবে তো?

দেখুন, আমার লোকেরা পথে–ঘাটে বেঘোরে মারা যাচ্ছে। আমি দু'দিন থেকে বিছানায় পিঠ দিতে পারিনি। আপনার সাথে কথা বলতেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম শেখ সাহেব, সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া খুব ভাল হবে কি? তিনি বললেন, আপনারা যদি আমার কথা মেনে নেন,তা'হলে আমি নিজে পাকিস্তানী সৈন্যদের গলায় হার পরিয়ে দেব।

আমাদের কথাবার্তা চলছিল, এমন সময় তাজুদ্দিন সাহেব ঢুকলেন। শোনা যায়, তার পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিলো। তাছাড়া ভারতের প্রতি তার ভক্তি ছিল অপরিসীম। তিনি ঢুকে কোন ভূমিকা না করেই বলতে শুরু করলেন, এখন আর এক ছাদের নিচে আমাদের অবস্থান সম্ভব নয়, যেখানে ভূট্টো রয়েছে। সে আমাদের এক নম্বর খুনি, দু'নম্বর খুনী ইয়াহিয়া খান। এখানে একটাই মাত্র পথ খোলা রয়েছে, এসেমব্লি দুটো করতে হবে।

আমি দু'জন বাঙ্গালী নেতার মতামত শুনে করাচী রওয়ানা হলাম। প্লেনে উঠে দেখি, লেঃ জেনারেল টিক্কা খানও যাচ্ছেন। তাকেও ইয়াইয়া খান ডেকে পাঠিয়েছেন। সহসা আমার মনে হলো, টিক্কা খানকে গভর্নর করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে না তো?

পরদিন এগারোটায় 'প্রেসিডেন্ট হাউজে' ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা হলো। 'লাউঞ্জে' বসে জেনারেল হামিদ, মিঃ ভূট্টো এবং প্রেসিডেন্ট বসে মদ্যপান করছিলেন। সামনের টেবিলের উপর ইয়াহিয়া ও হামিদ দু'জনই পা তুলে বসেছিলেন। সহসা আমার মনে হলো রোম জ্বলছে, আর সম্রাট নীরো বাঁশী বাজাচ্ছেন।

আমি একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লাম। বসেই ইয়াহিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আমার এমন কিছু কথা আছে, যা ভূট্টো সাহেবের পক্ষে শোনা সমীচীন হবে না। আমার কথা শেষ না হতেই ভূট্টো হাতের গ্লাসসহ উঠে অন্য কামরায় চলে গেলেন।

প্রথমদিকে ইয়াহিয়া খানকে মদের নেশায় বেশ ক্রুদ্ধ মনে হলো। বললেন, জেনারেল ইয়াকুব তা'হলে ইস্তফা দিয়ে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে, আমার অনুমতি ছাড়াই? এসব মোটেই বরদাস্ত করা হবে না, আমি আপনাদের সকলকে 'কোর্ট মার্শাল' করব। আমি বললাম, জেনারেল ইয়াকুব পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু চার্জ কাউকে দেননি। তিনি আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। আমরা সবাই মিলে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনি যে ঢাকাতে একটুও যেতে চান না।

এরপর আমি ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করলাম বললাম, পরিস্থিতি এখন

ছ'দফাকেও ছাড়িয়ে গেছে। যেখানে ভূট্টো আছে, সেই এসেমব্লিতে তারা বসতেও নারাজ। দুই আইন, দুই হাউজ- এবং কনফেডারেশন কথা পর্যন্ত উঠেছে।

আমি লক্ষ্য করলাম, ইয়াহিয়া খান এসব কথা গুলোর ঠিক মর্মে পৌছতে চেষ্টা করছেন না। কথার মাঝ খানেই তিনি বলে বসলেন, আমি জেনারেল টিক্কা খানকে পাঠাচ্ছি।গভর্নর বদলের পর হয়ত ঘটনাবলীর নতুন মোড় নিতে পারে।

আমি আহত মন নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। আমার মন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। ঢাকাতে রক্তের খেলা চলছে, আর এখানে জেনারেল সাহেবরা সুরা- সাকী নিয়ে ব্যস্ত। ভূট্টো, ইয়াহিয়া, হামিদ তিনজনই দেশের পরিস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে মদে ডুব দিয়েছেন।তাদের ভাবসাব দেখে মনে হলো, আমাদের ধ্বংস আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানকেই নিজের ভিত্তি বলে মনে করে বসলেন। ইয়াহিয়া খান আমাকে বলেছিলেন, অচিরেই একটা রাজনৈতিক মীমাংসা তিনি করবেন। ৬ই মার্চ আমি পিণ্ডি থেকে করাচী আসার পথে রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের ভাষন শুনলাম। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৫ তারিখে ঘোষনা করলেন, এই সঙ্গে হুমকিও দিলেন যে, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারীদের কঠোর হস্তে নির্মূল করা হবে।

৭ই মার্চ আমি জেনারেল টিক্কা খানের সাথে ঢাকা পৌছলাম। এ সময় শেখ মুজিব 'রেস কোর্সের' জনসমুদ্রে তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমরা বিমান থেকে এই বিশাল জন-সমাবেশ দেখলাম। আমার অনুপস্থিতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ন ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। আমার নিজের চোখে দেখলাম, ব্রিগেডিয়ার জিলানীর মাধ্যমে প্রেরিত শেখ মুজিবকে লিখিত ইয়াহিয়া খানের পয়গাম।এতে লেখা ছিল- তুমি যা দাবী করছ, তার চাইতে বেশী কিছু দিতেও আমার আপত্তি নেই। আমি অচিরেই ঢাকা আসছি, তখনই বিস্তারিত আলাপ হবে। সম্ভবতঃ এই পত্র এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে শেখ মুজিব এমন কোন কথা ঘোষণা না করে বসেন, যেখান থেকে তিনি আর ফিরে না আসতে পারেন।

জেনারেল টিক্কা খান এসেছেন। জেনারেল ইয়াকুব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আজ পূর্ব পকিস্তান এক বিপজ্জনক বাঁকে এসে উপনীত। এক আমল এবং এক নেতৃত্বের যবনিকাপাত হয়ে আজ নতুন দিনের রক্তাক্ত সূর্য উষার দুয়ারে উঁকি মারছে।

এরপরের কারবালা কাহিনী সবারই জানা। ঢাকাতে সপ্তাহ কালের মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ব্যর্থ হয়। হঠাৎ ২৫শে মার্চ ইস্রাফিল যেন হুংকার দিয়ে উঠল। ভূট্টো-ইয়াহিয়ার চাপিয়ে দেয়া এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমাদের নেমে পড়তে হলো। পাকিস্তান রক্ষার নামে আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নিলাম এবং দীর্ঘ নয় মাস আমরা অসংখ্য নারী -পুরুষ ও শিশুর প্রাণ সংহার করেও নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারিনি। অবশেষে উপমহাদেশের সেরা পাকিস্তানী সৈন্য ভারতীয়দের হাতে অস্ত্র সমর্পণ করে। শতাব্দীর কান্না বিজড়িত একটি মুহর্তে জেগে উঠল একটি দেশ একটি জাতি। জুলুম- নির্যাতন, আর হত্যা-ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের যবনিকাপাত হলো।

মা ও বাবার সস্নেহ আলিঙ্গনে শেখ মুজিব

শেখ জামালের বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি ঐতিহাসিক চিত্র

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব মরহুম জহির রায়হান কোলকাতার এক জনসভায় ভাষন দিচ্ছেন। ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তানে বন্দী শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে কোলকাতায় এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। জহির রায়হানের অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারও নিহত হয়েছেন রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে। জহির রায়হান দেশ স্বাধীনের পর মিরপুরের কোন একটি এলাকায় রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হন

সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান, তদানীন্তন আওয়ামীলীগের অন্যতম প্রধান নেতৃবৃন্দ। এরা জিয়ার আমলে চার জনই নির্মম লোমহর্ষক জেল হত্যার শিকারে পরিনত হয়েছিলেন

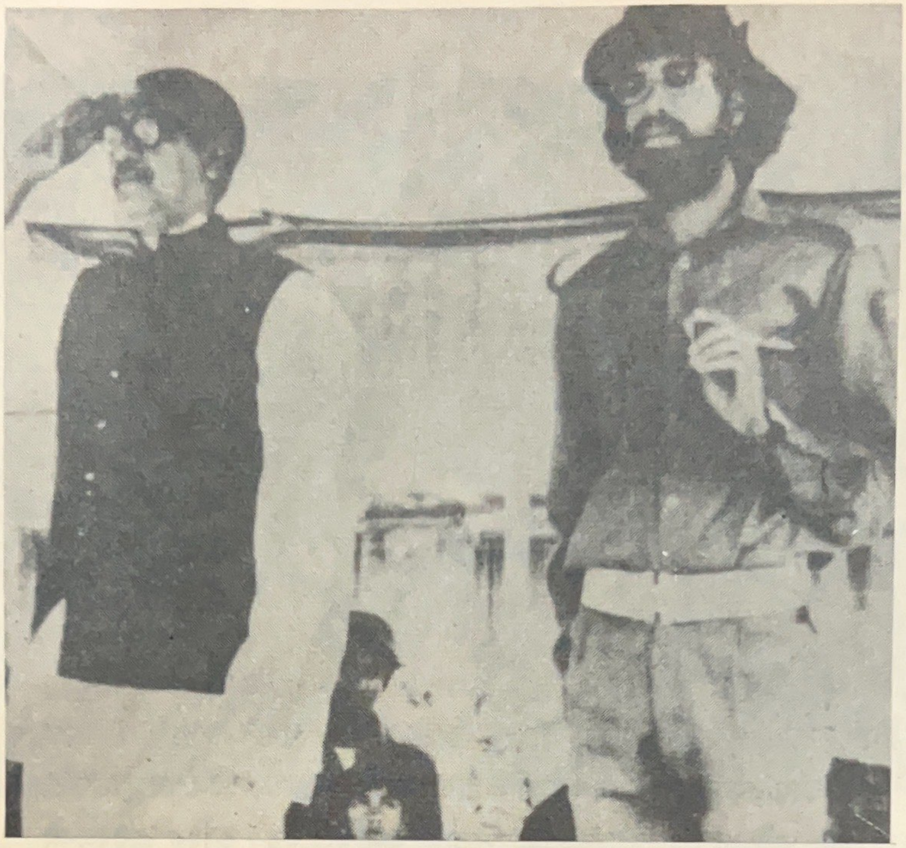

কাদের সিদ্দিকী, দীর্ঘ দেড়যুগ ভারতে স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর সম্প্রতি দেশে ফেরেন এবং পূর্বেকার কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হন

১৯৭৪ সালে আনোয়ার সাদাতের সাথে কায়রোতে শেখ মুজিব

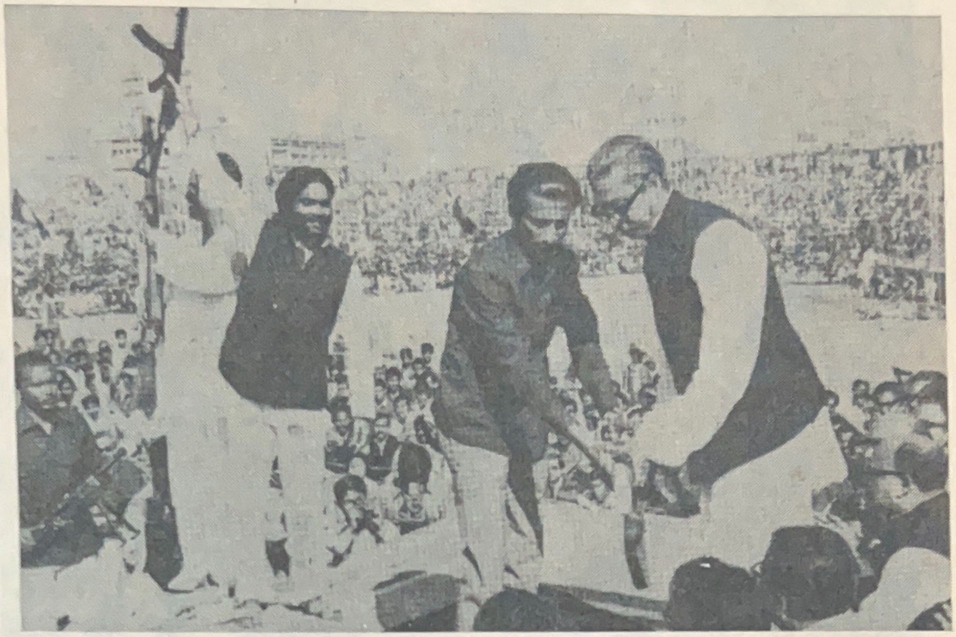

অস্ত্র সর্ম্পনের ডাকে সাড়াদিয়ে তদানীন্তন মুজিব বাহিনী প্রধান শেখ ফজলুল হক মনি শেখ মুজিবের হাতে অস্ত্র সমর্পন করছেন। পেছনে সিরাজুল আলম খান ও অন্যান্য যুবলীগ নেতৃবৃন্দ

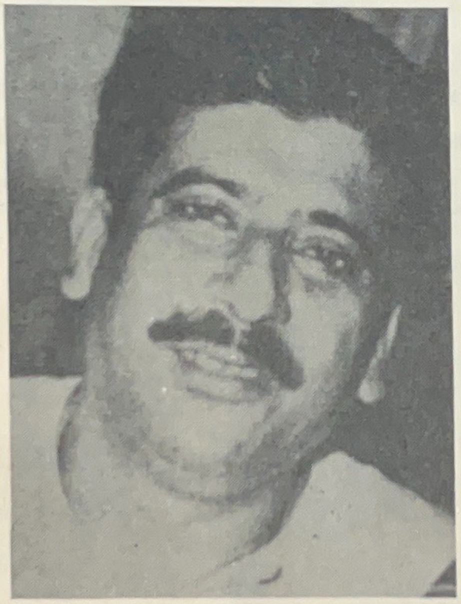

শেখ নাসের, শেখ মুজিবের একমাত্র ভ্রাতা, যিনি খুলনা এলাকায় ব্যবসা করতেন। বত্রিশ নম্বরের হত্যা কাণ্ডের সময় ঘটনাক্রমে তিনি সেখানে ছিলেন। তিনিও অকুস্থলেই শহীদ হন

প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন শেখ মুজিব চট্টগ্রাম বন্দরে কাষ্টম আটক কৃত বেআইনী ভাবে আনীত কাপড় দেখছেন। সঙ্গে তথ্যমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মনসুর আলী ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা রয়েছেন

"ডটার. অব দি ইস্ট" খ্যাত বেনজির ভুট্টো। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধের শ্লোগান নিয়ে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার পদে আসীন

আপামর জনগনের নয়নের মনি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি দূর্লভ পারিবারিক চিত্র

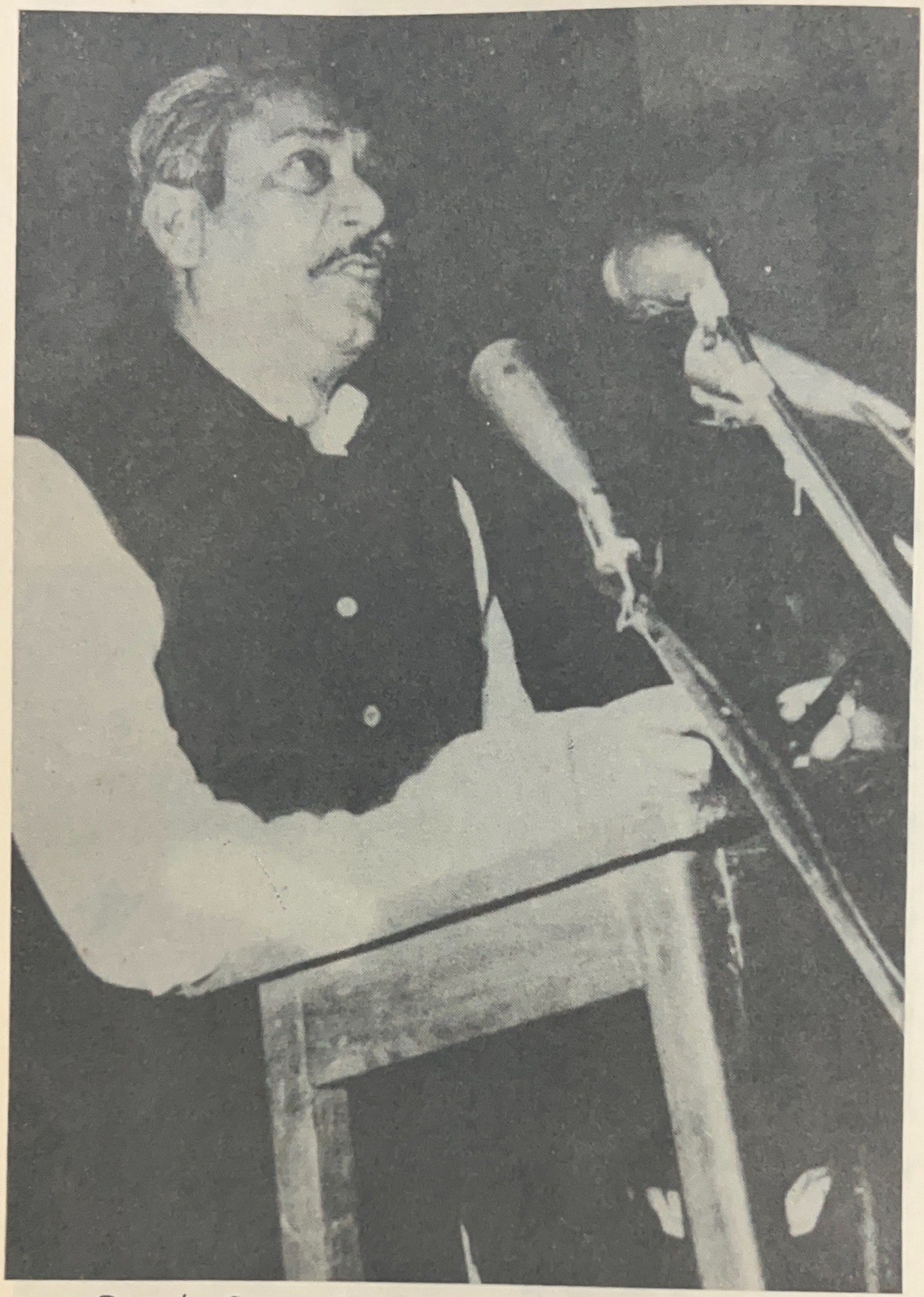

জলদগম্ভীর কন্ঠ মণ্ডিত একটি বজ্র কঠিন ব্যক্তিত্ব, যার জ্বালাময়ী ভাষনে থাকতো প্রানস্পর্শী ভাষাবেগ এবং নিদারুন আকর্ষন।

৭ই মার্চের সেই ভাষন ÷ "আর যদি একটা গুলি চলে" ÷ একটি গগণ বিদারী আহবান হিসাবে আজও বাংলার আকাশে বাতাসে মুখরিত

অতিরিক্ত অধ্যায়:
জিয়া প্রসঙ্গ

শহীদ জিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ সালে বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ সালে কমিশন লাভ করেন।

১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন ফার্ষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী কমাণ্ডার এবং লাহোরের খেমখারান সেক্টরে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি কাবুলস্থ পাকিস্তান সামরিক একাডেমী ইন্সট্রাক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি কোয়েটা ষ্টাফ কলেজে যোগ দেন।

১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে নবগঠিত অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গল রেজি-মেন্টের দায়িত্ব দিয়ে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের পক্ষাবলম্বন করে ২৭শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে তিনি সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে জিয়াউর রহমান কুমিল্লায় একটি ব্রিগেডের কমাণ্ডার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭২ সালের জুনে তাঁকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তিনি সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন।

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহে জিয়া উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি জিয়া লণ্ডন ও লুসাকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, সিডনীতে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের আঞ্চলিক সম্মেলন, কল-ম্বোতে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেন এবং সৌদি আরব, মিসর, সংযুক্ত আরব আমীরাত, কুয়েত, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, জাপান, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, নেদারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, মালী, সেনেগাল, গিনি এবং পশ্চিম জার্মানীতে রাষ্ট্রীয় সফর করেন।

ব্যক্তি জীবনের ছিটেফোটা

অনেকবার রিফু করা. তালি দেয়া একটি হালকা প্রিন্টের পাজামা; একটি ঢিলে শার্ট। বার বার সেলাই আর তালির অত্যাচারে শার্টটির পিঠের ডান দিক চটের মত ভারী হয়ে গেছে।

এগুলো প্রেসিডেন্ট জিয়া ব্যবহার করতেন। কালে-ভদ্রে কখনো বঙ্গভবনে বিশ্রামের সময় পেলে তিনি এই ছেঁড়া পাজামা শার্ট স্লিপিং স্যুট হিসাবে পরতেন।

সরকারী দায়িত্বের কারণেই প্রেসিডেন্ট জিয়ার একান্ত সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এমন দু'জন পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে সম্প্রতি বঙ্গভবনে আলাপ হলো।

আলাপের এক পর্যায়ে তাঁরা এই পাজামা আর শার্ট আমাকে এনে দেখালেন।

নিজের চোখে না দেখলে আমিও একথা বিশ্বাস করতাম না। প্রেসিডেন্টের চেয়ারের দাবীতে জিয়া সব সময়ই ভাল কাপড় পরেছেন। সাফারী এবং সান গ্লাস পরে তিনি বাইরে এসেছেন। কিন্তু ঘরের ভেতরে, একান্ত নিভৃতে তিনি ছিলেন অতি সাধারণ একজন মানুষ। ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে, রিফু করে ব্যবহার করেছেন তিনি। চট্টগ্রামে সার্কিট হাউজেও তার ভাঙ্গা সুটকেসে পাওয়া গেছে ছেঁড়া গেঞ্জি। কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে। আমরা আমাদের দেশে দেখেছি—বাড়ির ভেতরে রাজকীয় জৌলুস। আর বাইরে—মিটিং এর মঞ্চে ছেঁড়া পাঞ্জাবীর হাতা দুলিয়ে বড় বড় শ্লোগান। প্রেসিডেন্ট জিয়া জাতির সঙ্গে হিপোক্রাসি করেননি বলেই জাতির কাছে আজ জিয়া সততার প্রতীক। তাঁর বিধবা পত্নী, দুটি নাবালক ছেলে আজ করুণার পাত্র।

নিত্যকার খাবার

বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের খাবারের ছিল দুপুরে ভাত, রাতে রুটি। ডাল থাকবে: ভাজি থাকবে। মাছ ও গোশত একত্রে থাকবে না। শীতের মওসুমে বঙ্গভবনে খেজুরের গুড়ের পায়েস রান্না হতো কখনও কখনও। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মে নিয়োজিত অনেকেই বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট

জিয়ার খাবারের আমন্ত্রণকে 'পানিশমেন্ট ফুড' হিসাবে বিবেচনা করতেন।

উপঢৌকন তোষাখানায়

বিশ্বের অনেক দেশ সফর করেছেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁকে দেয়া হয়েছে অনেক অমূল্য উপহার। এসব উপহার—এমনকি ব্যক্তিগতভাবে দেয়া উপহারও তিনি নিজে নেননি। সব জমা দিয়েছেন বঙ্গভবনের তোষাখানায়। পাকিস্তান থেকে আগত তাঁর এক বন্ধুর আনা একটা কোর্তাও তিনি জমা দিয়েছেন তোষা খানায়। এগুলো সব রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। একজন কর্মকর্তা বললেন, ইরানের সাবেক সম্রাজ্ঞী ফারাহ দীবা বেগম জিয়াকে ব্যক্তিগত উপহার হিসাবে ফিরোজা পাথর বসানো একটি আংটি উপহার দিয়েছিলেন। সেই আংটিও জমা হয়েছে তোষাখানায়। প্রত্যেকটি জিনিষের ইনভেন্টরী রক্ষিত আছে বঙ্গভবনে।

সহনশীলতার অনন্য নজির

প্রেসিডেন্ট জিয়া গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একদল ছাত্র আগে থাকতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাকে অপমান করবে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নেমেই তিনি দেখলেন একদল ছাত্র তার হাটার পথে বেরিক্যাট সৃষ্টি করছে এবং নানা শ্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু তিনি সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন, কিন্তু তারপরও অহেতুক তার উপর ইট পাটকেল বর্ষণ চলল। তারপরও তিনি হেটে চললেন এবং বললেন, আপনাদের কি দাবী বা আপনারা কি বলতে চান সেইটেই আমাকে আগে বলুন। কিন্তু তারা এর সদুত্তর না দিয়ে আরো ইট পাটকেল এবং এমনকি, ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষীরা তার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল। এক পলকের মধ্যে তিনি তাদের নির্মূল করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন। এই অহেতুক বিরুদ্ধবাদী ছাত্রদের পরে তিনি রাজনৈতিকভাবেও অসুবিধায় ফেলতে চেষ্টা করেন নি। এধরণের আরো অনেক সহনশীলতার ঘটনা তার জীবনে ছড়িয়ে আছে। সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি।

জিয়ার ছেলেবেলা

জিয়ার ছোটবেলার ডাক নাম ছিল কমল।

কমলের দাদা মৌলভী কামালউদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী, গায়ের রঙ ছিলো ধবধবে ফর্সা। কথা বলতেন বিশুদ্ধ বাংলায়। ছেলেমেয়েদের ডাকতেন পুরো নাম ধরে। বগুড়া জেলার বাগবাড়ি আসলে তাঁর শ্বশুর বাড়ি। তিনি ছিলেন নিকটবর্তী মহিষাবান গ্রামের অধিবাসী। অভিজাত ও ধনাঢ্য পরিবারের জামাই হয়েও তাঁর জীবনযাপন ছিলো সাদাসিধে। যাতায়াত করতেন পায়ে হেঁটেই, পালকীতে চড়তেন না। খাওয়ার-দাওয়ার ব্যাপারেও ছিলো বাছ বিচার। চিংড়ি মাছ খেতেন না। বলতেন, ওটা খাওয়া মাকরূহ্। ছেলেমেয়েদের অনেক সময় নিজেই পড়াতেন। সে আমলে তাঁদের তিনি বীজ গণিত সম্বন্ধে জ্ঞান দিতেন মাতৃভাষাতেই। তাঁর পোশাক ছিলো আপাদমস্তক সাদা। মুখেও ছিলো ধবধবে সাদা লম্বা দাড়ি। ছোট-বেলায় কমল অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলো দাদার প্রতি। খুব লক্ষ্য করতো তাঁকে। কিন্তু কাছে ঘেঁষতে চাইতো না একদম।

কমল ছিলো লাজুক স্বভাবের। ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলতো, মিথ্যা কথা বলতে পারতো না। সঙ্গী সাথীদের মধ্যে যখনই দেখা যেতো তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেছে, কমল নীরবে সরে যেতো ঘটনাস্থল থেকে।

মৌলভী কামালউদ্দিনের সাত ছেলে দুই মেয়ে। পঞ্চম ছেলে মনসুর রহমান। তিনি ছিলেন একজন কেমিস্ট। তাঁরই দ্বিতীয় ছেলে জিয়াউর রহমান ওরফে কমল। কমলের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারী।

কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার বছর চাচা ডাঃ রহমান কমলদের রেখে আসেন গ্রামের বাড়িতে—বগুড়া জেলার বাগবাড়িতে। প্রায় দু'বছর ঐ গ্রামের স্কুলে পড়েছেও সে। দাদা-দাদীর সান্নিধ্যে আসে ঐ সময়। চাচা মমতাজুর রহমানের খুব ভক্ত ছিলো কমল। নববধূ চাচীরও খুব ভক্ত হয়ে পড়ে। সারাক্ষণ থাকতে চাইতো চাচীর সঙ্গে, রাতের বেলায় ঘুমিয়ে পড়তো চাচীর বিছানায়।

লাজুক কমল অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তো না কখনোই। সবাই যখন হো-হো হাসিতে গড়িয়ে পড়ছে, কমলকে তখন দেখা গেছে ঠোঁট টিপে একটু হাসতে মাত্র। অসম্ভব কৌতূহলী ছিলো। যা কিছু দেখতো, তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতো। মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুদ্ধ ফেরত চাচা ডাঃ ক্যাপ্টেন মমতাজুর রহমানের সামরিক পোশাক নিয়েও তাঁর কৌতূহলের অবধি ছিলো না। বার বার নেড়েচেড়ে দেখতো ঐ পোশাক। পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীতে যোগদানের পেছনে শৈশবের সেই আকর্ষণ প্রভাব বিস্তার করেছে মনে হয়। অবশ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু শেষাবধি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

কমলের 'বাচ্চু মামা' মেজর ডাঃ নঈমুল ইসলাম। একাত্তরে তিনি পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর হাতে নিহত হন।

কমলের নানা জলপাইগুড়ির বিখ্যাত 'টি ফ্যামিলি'র জনাব আবুল কাসেম। 'টি ফ্যামিলি' নামটি মহারানী ভিক্টোরিয়ার দেয়া, কারণ এই পরিবারই ছিলো প্রথম এদেশীয় কোনো চা বাগানের মালিক। নানা আবুল কাসেমের ভাই আবদুর রশীদ (বড়) ছিলেন সে আমলে মোহামেডান স্পোর্টিং-এর বিখ্যাত খেলোয়াড়। নানী রহিমা খাতুনও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। তিনি এখনো জীবিত। বয়স ৮২ বছর। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ, তাঁরা নাক-চোখ-মুখ বিদেশিনীর মতো। ঢাকাতেই তিনি থাকেন, কনিষ্ঠ ছেলে রুহুল আমিন (ছবি) এর বাসায়। তাঁর দ্বিতীয় কন্যা জাহানারা খাতুন (রানী) কমলের মা।

নানার পরিবার ছিল সঙ্গীত প্রিয়। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই নানী বললেন, 'গানবাজনা ছিলো আমাদের মজ্জাগত। তবে আমার বড়ো মেয়ে (সুফিয়া প্রধান খুকী) যেদিন গান গাইতে শুরু করলো সেদিন থেকেই আমি গান গাওয়া বন্ধ করেছি।'

কমলের মা (রানী) প্রধানতঃ গাইতেন নজরুল গীতি। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পর মনসুর রহমান করাচীতে চলে যান। রেডিওতে তখন প্রায় নিয়মিত অনুষ্ঠান করতেন জাহানারা খাতুন। গায়িকা হিসেবে জনপ্রিয়তাও পেয়েছিলেন তিনি। প্রখর স্বাজাত্য বোধও ছিলো তাঁর

মধ্যে। কমলের চাচী শরীফুন্নেসা আজগরী খানম (বেগম মমতাজুর রহমান) স্মৃতি হাৎরে বলেন, করাচীর বাসায় তাঁকে আমি এক প্যাঁচে শাড়ি পরতে দেখে কারণ জানতে চেয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক আচরণে ক্ষুব্ধতা প্রকাশ ক'রে রানী আপা জানিয়েছিলেন—ওদের বোঝাতে চাই আমরা আলাদা।'

মুরগীর গোশত খুব প্রিয় ছিলো কমলের। পাখনার গোশত খেতে ভালোবাসতো। পাখনাকে বলতো 'লাঙল'। আর প্রিয় খাবার ছিলো বাসী ভাত, পিঁয়াজ—কাঁচামরিচ দিয়ে ভেজে।

দাদা মৌলভী কামালউদ্দিনের সাদাসিধে জীবনের প্রভাব রয়েছে এই পরিবারে। 'প্লেইন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং ছিলো আদর্শ। এক তরকারী দিয়েই খাওয়া দাওয়া সারে সবাই। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যখন তিনি, তখন মাঝে-মধ্যে গেছেন চাচার বাসায়। সবসময় গেছেন সস্ত্রীক। খাওয়ার টেবিলে একাধিক তরকারি দেখলে সমালোচনা করতেন।

কমলের ছোট মামা রুহুল আমিনের সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত মিলছিল। কিন্তু শুধু যে অবয়বগত সাদৃশ্য আছে তা নয়, চলাফেরা, বসার ভঙ্গি থেকে শুরু করে কণ্ঠস্বর পর্যন্ত প্রায় একই রকম। এজন্য অনেকেই তাঁকে তার বড়ো ভাই ব'লে ভুল করতেন। বয়সে তিনি জিয়াউর রহমানের চেয়ে চার বছরের বড়ো। বিয়ে করেছেন চাচাতো বোনকে। ব্যবসায়ী মানুষ। জাতীয় সংসদের স্পীকার মির্জা গোলাম হাফিজ তাঁদের নিকট আত্মীয় অর্থাৎ মা রহিমা খাতুনের আপন খালাতো ভাই। কমল সম্পর্কে একটি রসিকতার কাহিনী শোনালেন মামা রুহুল আমিন। তিনি তখন দিনাজপুরে আছেন। ভাগ্নে কমলের তখন পোস্টিং হয়েছে ওখানে। কিন্তু মামা-ভাগ্নের দেখা নেই অনেকদিন। একদিন দোকানে ব'সে আছেন, তখন সামরিক পোশাক পরা এক ব্যক্তি, ইয়া মোটা গোঁফ তাঁর, এসে হাজির। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি শুধু হাসলেন, একটি কথাও বললেন না। পরে হাসতে হাসতেই চ'লে গেলেন। রুহুল আমিন তো তাজ্জব, লোকটি কে? এদিকে তাঁদের বাসায় গিয়ে নানীর কাছে কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে

কমল হেসে খুন—দেখো, দেখো, মামাকে কেমন ঠকিয়ে এসেছি।

এখানে উল্লেখিত তথ্যের অধিকাংশই প্রেসিডেন্ট জিয়ার একমাত্র জীবিত চাচা মেজর (অবঃ) মমতাজুর রহমানের কাছ থেকে পাওয়া। তিনি অনেক কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কমলকে। ছোট বেলার শান্ত নীরব স্বভাবের কমলকে দেখে তিনিই মন্তব্য করেছিলেন বিস্ময়ের সঙ্গে, 'ও তো দেখছি বড়ো হলে মৌলভী হবে!' সেই ছোট বেলাতেই জিয়ার পর্যবেক্ষণ-স্বভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি। নতুন কোনো কিছু দেখলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস ছিলো তাঁর। একবার তক্ষশীলায় বেড়াতে যাওয়ার সময় কেন জানি বারবার পিছিয়ে পড়ছিলো জিয়ার গাড়ি। অনেক পথ এগিয়ে গিয়ে তারপর গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছিলো চাচাকে। এতো দেরী হচ্ছে কেন? খোঁজ নিয়ে চাচা জানলেনঃ রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার জন্যেই দেরী হচ্ছে কমলের। এই কৌতূহল আজীবনই ছিলো তাঁর।

আমরা অনুসন্ধানে জেনেছিঃ কলকাতার হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন জিয়াউর রহমান। দশ/এগারো বছর পর্যন্ত ঐ স্কুলেই পড়েছেন। তাঁর বড়ো ভাই রেজাউর রহমানও পড়েছেন ঐ স্কুলে।

নিকট আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে পারেননি বলে কিছুদিন আগে আক্ষেপ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া এমন একজনের কাছে বলেছিলেন, 'আমি তো কিছুই করতে পারলাম না মাথায় ছাদটুকু পর্যন্ত না। একদিন আত্মীয়স্বজনের বাসায় আশ্রয়ের জন্য গেলে তারা হয়তো আমাদের পুছবেই না।'

লাজুক স্বভাবের কমল একদিন রাষ্ট্রনায়ক হবে, একথা ভাবিনি। কিন্তু তার ভেতরে ছিল দেশ সম্পর্কে, দেশের মানুষ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, আনুমানিক ৫৫ সালের কথা। যুদ্ধের মহড়ার ট্রেনিং চলছে কুমিল্লা সেনানিবাসে। শীতের রাত। যুদ্ধের মহড়া দিতে গিয়ে লুকিয়েছিল এক কৃষকের গোয়াল ঘরে। ভোর হয়ে গেছে। তখন পানি চেয়েছিলো একজন লোকের কাছে। কিন্তু লোকটি জবাব দিয়েছিল উঁহু'তে। তাই তার কমল পানি খায়নি।

তিনি আরো বললেন, শেখ মুজিবের শাসন আমলে যখন জিনিসপত্রের

দাম বাড়ছে হৈ হৈ করে। কমল এ নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করতো। তখন আমি বললাম, তোমাকে ক্ষমতা দিলে সব ঠিকঠাক করতে পারবে? কমল বলেছিলো পারবো। তখন বুঝতে পারিনি সত্যি তার ক্ষমতা ছিল।

তিনি কমলের আর একটি স্বভাবের কথা বললেন। বললেন, কমল সিগারেট খেতো না। তবে খুব টেনশনে থাকলে সিগারেট খেতো। ছোট্ট একটি টেবিল দেখিয়ে তিনি বললেন, এই টেবিলে বসে মাঝে-মধ্যে সিগারেট চেয়েছে, খেয়েছে। তখনই বুঝেছি, কমল টেনশনে আছে।

কমলরা পাঁচ ভাই। বোন নেই। কমল দ্বিতীয়। বড় ভাই রেজাউর রহমান ইনজিনিয়ার। জাম্বিয়ায় চাকরি করেন। তৃতীয় ভাই মিজানুর রহমান বিসিসিআই-এর লণ্ডন ব্রাঞ্চে চাকরি করেন। ৪র্থ ভাই খলিলুর রহমান ফার্মাসিস্ট। যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিরত। ছোট ভাই আমমেদ কামাল, ঢাকাতে পর্যটনে চাকরিরত।

কমল মাঝে মধ্যে ছোট চাচার বাসায় উঠতেন। তার ছোট চাচী শামসুন্নাহার বেগম বললেন, আমার বছর দুয়েকের ছোট ছিল কমল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ৫৪ সালে। তখন মাঝে-মধ্যে বেড়াতে আসতেন আমাদের বাসায়। কম কথা বলতেন। তখন ছিল কিছুটা লাজুক স্বভাবের। ৬৫ সালের দিকে এসে তাঁর স্বভাবে পরিবর্তন আসে। কিছুটা গম্ভীর হয়।

তিনি বললেন ৬৫ সালের যুদ্ধের কথা কমল প্রায় বলতো। আমরা মশ্‌করা করে তখন বলতাম, এতো যুদ্ধ করেছ—অথচ কাগজে-পত্রে তো তোমার ছবি দেখি না। হাসতে হাসতে জবাব দিতো কমল, 'আমি সামনে থেকে যুদ্ধ করেছি। সেখানে কাগজের লোকরা যেতে সাহস পায় না। ছবি তুলবে কি করে?'

তিনি আরো বললেন, তখন তাঁর খুব সিনেমা দেখার সখ ছিল।

৬০ সালে কমল বিয়ে করে পুরানা পল্টনে আমার বাড়িতে ওঠে। শাহবাগ হোটেলে তখন আমরা তার বিয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করি।

তিনি আরো বললেন, ৬০ সালের কথা। তখন সিরাজুল ইসলাম নামে তার এক আত্মীয় ছিলেন। যশোরের এমপি। করাচীতে জাতীয় সংসদে তাঁর কাছ থেকে পাশ নিয়ে প্রায়ই সংসদে যেতেন।

উপমহাদেশের সেরা সমরসেনা পাকিস্তানী বাহিনীর সদস্যরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অস্ত্র সমর্পন করছেন অকুতোভয় বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনী ভারতীয় সেনাদের কাছে।

দেশ হানাদার মুক্ত হওয়ার পর দালাল ও রাজাকার খ্যাত লোকদের এভাবে গন– ধোলাইর কবলে পড়তে হয়েছে। তখন প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল খুবই প্রবল, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে

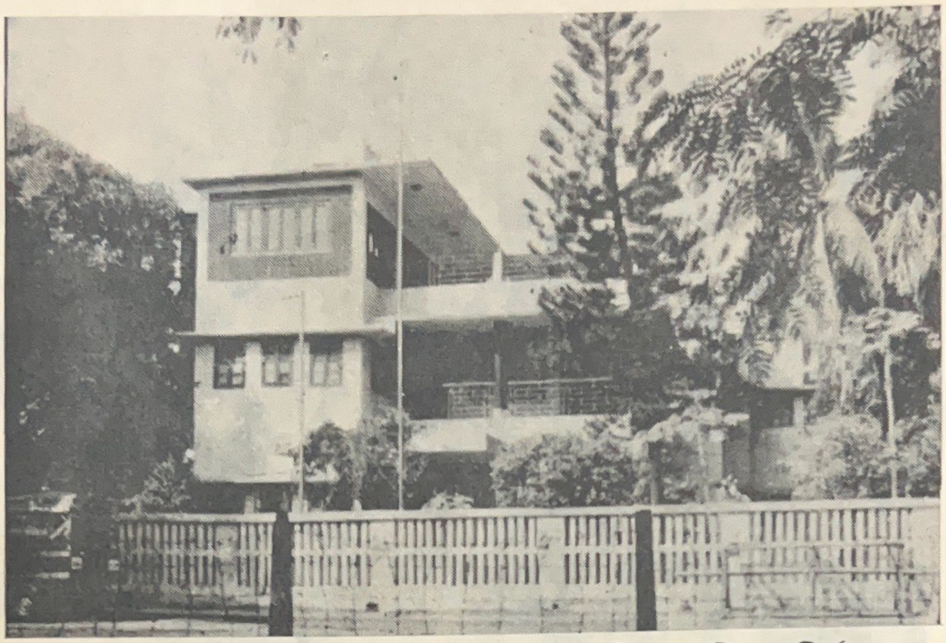

ধানমণ্ডীর ৩২নং রোডের সেই বাড়িটি, যেখানে শেখ মুজিব সপরিবারে নির্মম ভাবে নিহত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় কোন রকম নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে তিনি নিয়মিত এখানে থাকতেন, যার খেসারত দিতে হয়েছিল তাকে এভাবে। মুজিবের তাজারক্ত এখনও সিড়িতে দর্শনার্থীদের আকুল করে তোলে।আজ এ ভবনটি ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে আওয়ামী লীগ ও দলীয় কর্মীদের তীর্থ স্থান।

ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের মাজারে দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শেখ মুজিব, পাশে রয়েছেন গাজী গোলাম মোস্তফা, জিল্লুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ, ডঃ কামাল হোসেন প্রমুখ

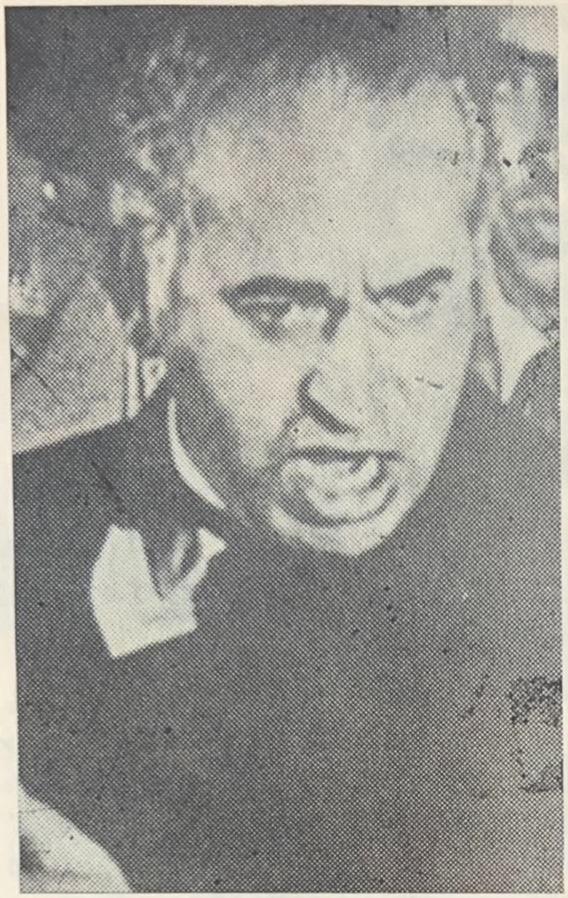

পট-পরিবর্তনের পর ভূট্টো যখন ক্ষমতা হারালেন, জেনারেল জিয়াউলহক তাকে ক্ষমতা অপব্যবহার ও বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁসি দেন। সেই করুন অবিশ্বাস্য পরিনতির দিনগুলোতে ভূট্টোর অভিব্যক্তি যেমনটি ছিল

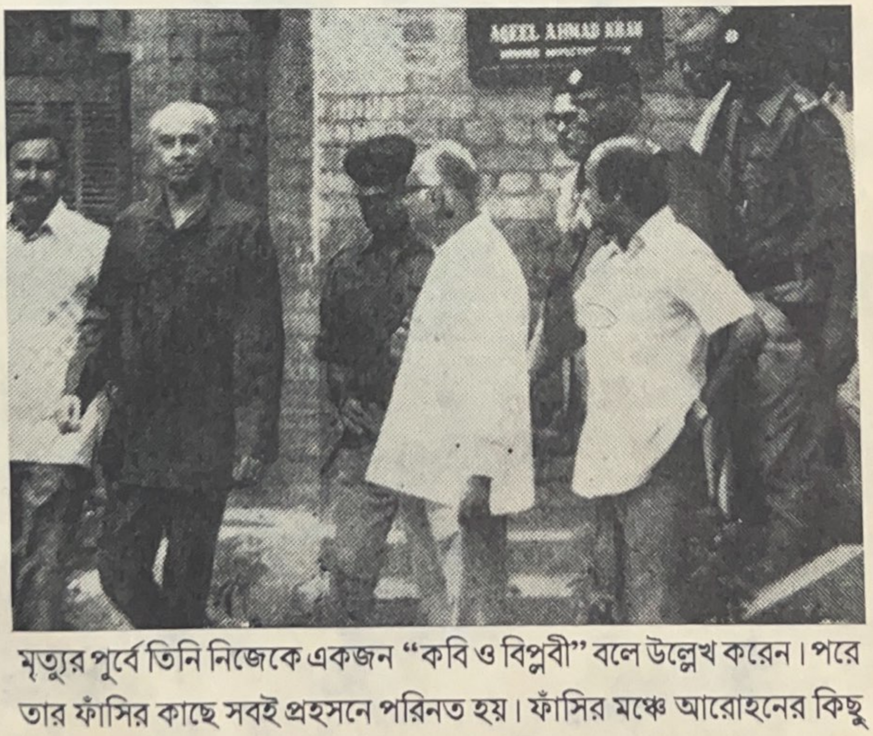

মৃত্যুর পুর্বে তিনি নিজেকে একজন "কবি ও বিপ্লবী" বলে উল্লেখ করেন। পরে তার ফাঁসির কাছে সবই প্রহসনে পরিনত হয়। ফাঁসির মঞ্চে আরোহনের কিছু পূর্বে তোলা ভূট্টোর এই ছবি

নেপালের রাজা বীরেন্দ্রকে মরহুম জিয়া ঢাকা বিমান বন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন (৪. ৩. ৮০)

প্রিন্স করিম আগা খান ও প্রেসিডেন্ট জিয়া বঙ্গভবনের এক বৈঠকে (২৯. ১০. ৭৯)

পারিবারিক পরিবেশে বেগম খালেদা জিয়া দুই সন্তানসহ

ব্যাথাতুর বেগম খালেদা জিয়া শহীদ জিয়ার মাঝারে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন

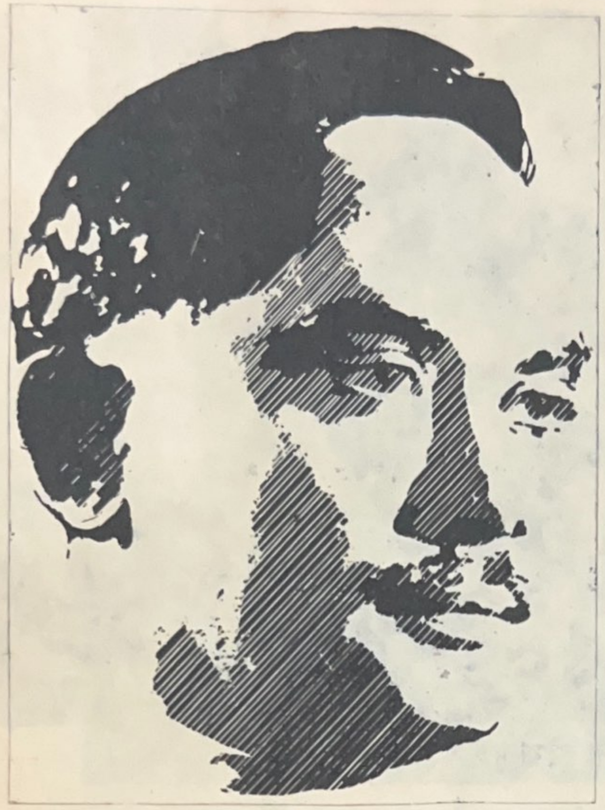

ফাষ্ট লেডি থাকা কালীন সময়ে নৌবিহারে দুই পুত্র সহ বেগম খালেদা জিয়া

হাস্যোজ্জ্বল জিয়া। একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। কিন্তু কৌশলী ক্যামেরাম্যান এই মুহূর্তটি ধরে রেখেছিলেন কোন এক সময়

পরলোকগত ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও মাদাম ইমেলদা মার্কোসের সাথে মরহুম জিয়া ও খালেদা জিয়া (২৭. ৫. ৮০)।

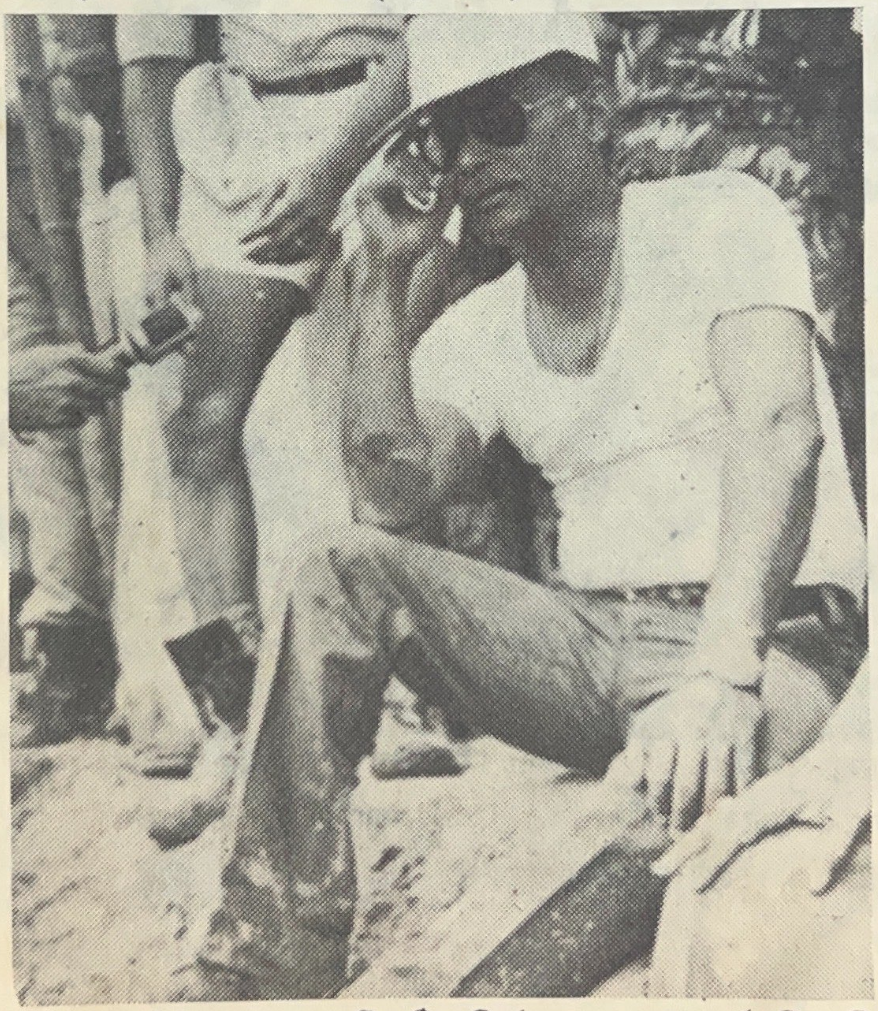

গ্রামীন অর্থনীতি উন্নয়নের চাবিকাঠি স্বনির্ভর আন্দোলনের দর্শন নিয়ে জিয়া নেমেছিলেন কালকাটা কর্মসূচীতে। নিজের হাতে খাল কাটতে গিয়ে তিনি গেঞ্জি ও প্যান্ট পরা অবস্থায় কাদা মাটিতে বসে
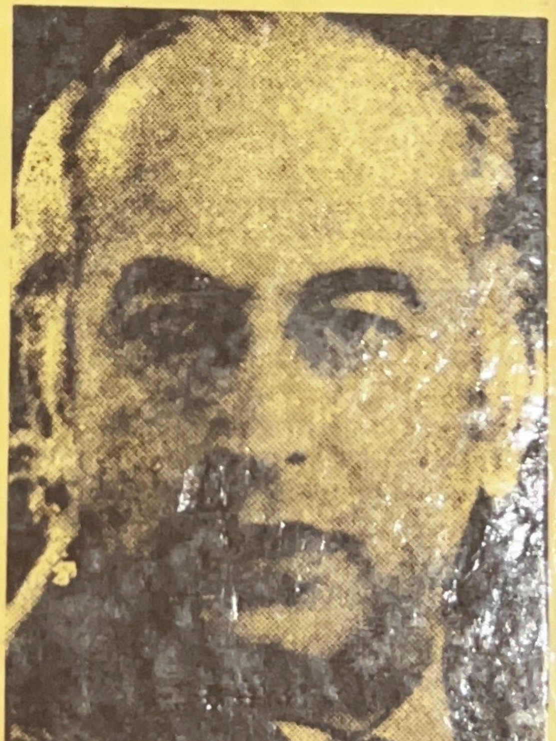
ভুট্টো
শেখ মুজিব
বাংলাদেশ